নব সাহিত্য-প্রসঙ্গ।

নারায়ণগঞ্জ উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়ের

প্রধান শিক্ষক।

শ্রীনবকৃষ্ণ ভাদুড়ী, এম, এ-প্রণীত।

[এই পুস্তকের নাম পূর্ব্ব পূর্ব্ব সংস্করণে "সাহিত্য-প্রসঙ্গ" ছিল। এখন হইতে ডিরেক্টর অব্ পবলিক ইনষ্ট্রাকসন বাহাদুরের অনুমতিক্রমে ইহার নাম "নব-সাহিত্য-প্রসঙ্গ" হইল।]

পঞ্চম সংস্করণ।

কলিকাতা,

১/১ শঙ্করঘোষের লেন, নব্যভারত-প্রেসে,

শ্রীউমেশচন্দ্র নাগ দ্বারা মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

মাঘ, ১৩০৫।

মূল্য ।০ চারি আনা।

ভূমিকা।

নিত্য প্রয়োজনীয় কয়েকটী নীতি অবলম্বনপূর্ব্বক এই ক্ষুদ্র গ্রন্থখানি লিখিত হইল। দৃষ্টান্ত সহযোগে নীতিশিক্ষা অধিক-ফল-প্রসবিনী—এই বিশ্বাসে সর্ব্বজনাদৃত কয়েকটী চরিত্রও ইহাতে নিবেশিত হইল। ইহার ভাষা উচ্চশ্রেণী ইংরাজি বিদ্যালয়ের পঞ্চম শ্রেণীর ও মধ্যশ্রেণী বিদ্যালয়সমূহের তৃতীয় ও চতুর্থ শ্রেণীর উপযুক্ত করিতে চেষ্টা করিয়াছি; কিন্তু তাহাতে কতদূর কৃতকার্য্য হইতে পারিয়াছি, তাহা শিক্ষক মহাশয়দিগের বিচারাধীন।

এখানে কৃতজ্ঞান্তরে স্বীকার করিতেছি যে অত্রস্থ ইংরাজি বিদ্যালয়ের প্রধান পণ্ডিত শ্রীযুক্ত যজ্ঞেশ্বর কর মহাশয় গ্রন্থখানির স্থলবিশেষ দেখিয়া দিয়া আমাকে পরম উপকৃত করিয়াছেন।

নারায়ণগঞ্জ
২৮শে ভাদ্র ১৩০০

শ্রীনবকৃষ্ণ ভাদুড়ী।

সূচী।

নব সাহিত্য-প্রসঙ্গ।

অপূর্ব্ব প্রতিহিংসা।

ইউরোপের দক্ষিণ ভাগে ইটালী নামে একটী মনোহর দেশ আছে। ভারতবর্ষের মত ইহারও পূর্ব্ব, দক্ষিণ, পশ্চিম, তিন দিক্ সমুদ্র বেষ্টিত। ইহার প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য দর্শন মানসে ও স্বাস্থ্যপ্রদ জলবায়ু সেবনার্থ পৃথিবীর নানা স্থান হইতে শত শত পরিব্রাজক সর্ব্বদাই এখানে আগমন করিয়া থাকেন। এক সময় ইটালী জগতের অধিশ্বরী ছিল। বর্ত্তমান সময়ে ইটালীর পূর্ব্ব গৌরব না থাকিলেও, শিল্পাদি বিষয়ে ইটালী এখনও পৃথিবীর শীর্ষ স্থানীয়া।

এই দেশের উত্তর পশ্চিম কোণে সমুদ্রোপকূলে "জেনোয়া" নামে অতি সমৃদ্ধি-সম্পন্না একটী নগরী আছে। শত বৎসর পূর্ব্বে ইহা স্বাধীন ছিল, এবং এখানে সাধারণতন্ত্র শাসন-প্রণালী প্রতিষ্ঠিত ছিল। অতি প্রাচীন কাল হইতেই এই নগরী বাণিজ্যের জন্য অতিশয় বিখ্যাত। ইহার অধিবাসিগণ অন্তর্বহি উভয়-

[illegible] রায় প্রভৃত ধনসম্পত্তির অধিকারী [illegible] বহু শতাব্দী পর্য্যন্ত আপনাদের স্বাধীনতা অক্ষুণ্ণ রাখিতে সমর্থ হইয়াছিল। অবশেষে নানা বিপর্য্যয়ের পর এখন ইহা ইটালী রাজ্যের অন্তর্ভূত হইয়া পড়িয়াছে।

পূর্ব্বে এখানে সাধারণতন্ত্র প্রণালী প্রতিষ্ঠিত থাকিলেও, শাসন ক্ষমতা প্রায়শঃই অভিজাত বংশীয়দিগের করকবলিত ছিল। কিন্তু একবার সাধারণ প্রজাবল বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়া উচ্চ বংশীয়দের হস্ত হইতে শাসনদণ্ড অপসারিত করিল। প্রজাবর্গ আপনাদিগের মধ্য হইতেই এক দল ব্যক্তিকে মনোনীত করিয়া শাসন-সমিতি গঠিত করিল; এবং ইউবার্টো নামা জনৈক সম্পত্তিশালী বণিক্ এই সমিতির অধ্যক্ষ মনোনীত হইলেন। ইউবার্টো অতি দরিদ্রের গৃহে নীচ বংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন; কিন্তু স্বীয় প্রতিভা ও পরিশ্রম বলে অল্প সময় মধ্যেই অবস্থার সম্যক্ পরিবর্ত্তন করিতে পারিয়াছিলেন।

সাধারণ প্রজাবর্গের ঐ শাসনও বহুদিন স্থায়ী হইল না। অভিজাত বংশীয়েরা মহতী চেষ্টার দ্বারা অতি শীঘ্রই শাসনদণ্ড পুনরায় আয়ত্ত করিলেন। কিন্তু তাঁহারা জয়লাভ করিয়াও নিশ্চিন্ত হইতে পারিলেন না। পাছে প্রজাবল আবার বর্দ্ধিষ্ণু হইয়া ভবিষ্যতে কোন বিপদ সংঘটন করে এই আশঙ্কায় তাঁহারা পরা-

জিত শত্রুর প্রতি কিঞ্চিন্মাত্র দয়া প্রদর্শন বা কোনরূপ সদ্ব্যবহার করিলেন না। প্রজা দলের অধিনায়ক ইউবার্টো রাজদ্রোহী বলিয়া ধৃত হইলেন। তাঁহার সমস্ত সম্পত্তি অপহৃত হইল, এবং প্রিয় জন্মভূমি জেনোয়া নগরী হইতে তিনি চিরদিনের নিমিত্ত নির্ব্বাসিত হইলেন। জেতৃগণ মনে করিলেন, তাঁহারা যে ইউবার্টোর শিরশ্ছেদনের পরিবর্ত্তে নির্ব্বাসন দণ্ড বিধান করিলেন, ইহাতেই তাঁহার প্রতি যথেষ্ট অনুকম্পা প্রদর্শিত হইল। দণ্ডাজ্ঞা শ্রবণ জন্য ইউবার্টো নূতন বিচারপতি আদর্ণের নিকট আনীত হইলেন। আদর্ণের হৃদয় স্বভাবতঃ নিষ্ঠুর ছিল না; কিন্তু উচ্চবংশমর্য্যাদানিবন্ধন তিনি অতিশয় অভিমানী ছিলেন, এবং পূর্ব্বোক্ত শাসনবিপ্লব তাঁহার হৃদয় কাঠিন্যে পূর্ণ করিয়াছিল। আদর্ণ দম্ভপরিপূর্ণ, ঘৃণামিশ্রিত, পরুষ ভাষায় ইউবার্টোকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "রে নীচাশয়, সূত্রধর পুত্র! তোর এতদূর স্পর্দ্ধা যে, তুই জেনোয়ার অভিজাতবংশীয়দিগকেও পদদলিত করিতে সাহসী হইয়াছিলি। কিন্তু থাক্, তোর প্রতি কৃপাপরবশ হইয়া তোর প্রভুগণ অন্য কোন শাস্তিবিধান করিলেন না, কেবল তুই যে নীচ অজ্ঞাত অবস্থা হইতে উৎপন্ন হইয়াছিস তাহাতেই তুই পুনর্নীত হইলি।"

ইউবার্টো এবম্বিধ কটূক্তি শুনিয়াও বিচলিত হই-

লেন না; বিচারাসনকে লক্ষ্য করিয়া সসম্ভ্রমে মস্তক অবনত করিলেন; পরে আদর্ণের দিকে চাহিয়া কহিতে লাগিলেন—"মহাশয়, অদ্য আপনি মৎপ্রতি যে ভাষা প্রয়োগ করিলেন, ইহার জন্য হয়ত আপনাকে এক দিন অনুতপ্ত হইতে হইবে।" অনন্তর ইউবার্টো গৃহ, পরিজন, ধনরত্ন সমস্ত পরিত্যাগ করিয়া মাতৃ-ভূমির নিকট চির বিদায় গ্রহণ পূর্ব্বক জাহাজে আরোহণ করিলেন।

প্রথমতঃ তিনি নেপল্‌স্‌ নগরে উপস্থিত হইলেন। এখানে কতিপয় বণিকের নিকট তাঁহার কিঞ্চিৎ অর্থ প্রাপ্য ছিল। এই বণিকেরা ইউবার্টোর বর্ত্তমান দুর্দ্দশা দেখিয়া তৎক্ষণাৎ তাঁহাকে স্বীয় স্বীয় ঋণ প্রত্যর্পণ করিল। এই সামান্য মূলধন সহযোগে তিনি দূরবর্ত্তী কোনও দ্বীপে গমন করিয়া তথায় ব্যবসায় আরম্ভ করিলেন। পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে, ইউঁবার্টো অতিশয় শ্রমসহিষ্ণু, কার্য্যকুশল ও বাণিজ্যাভিজ্ঞ ব্যক্তি ছিলেন। অতএব অতি অল্প কাল মধ্যে তিনি পুনরায় স্বীয় অবস্থার সম্যক্‌ উন্নতি সাধনে সমর্থ হইলেন। জন্মভূমি হইতে নির্ব্বাসন ভিন্ন তাঁহার আর কোন দুঃখ রহিল না।

বাণিজ্যোপলক্ষে তাঁহাকে অনেক স্থানে গমনাগমন করিতে হইত। আফ্রিকা মহাদেশের উত্তর উপকূলে

টিউনিস্ নামে একটী নগর আছে; ইউবার্টোকে সর্ব্বদাই এখানে আসিতে হইত। এই নগর মুসলমানদের অধিকৃত ছিল, এবং অধিবাসীরাও মুসলমান ছিল। ঘটনাবশতঃ এই সময়ে এই নগরের সহিত জেনোয়া নগরীর বিশেষ শত্রুতা হইয়াছিল। ইউবার্টো এ সময়ে ভিন্ন রাজ্যে বাস করিতেছিলেন বলিয়াই টিউনিস্ নগরের সহিত বাণিজ্য করিতে পারিতেন। সেই সময়ে মুসলমানদিগের সহিত খৃষ্টীয় ধর্ম্মাবলম্বীদিগের প্রায়শঃই যুদ্ধ সংঘটিত হইত। যুদ্ধে পরাজিত খৃষ্টীয়ানদিগকে মুসলমানেরা ক্রীতদাস করিয়া রাখিত; অত্যধিক অর্থ না পাইলে উহাদিগের মুক্তি বিধান করিত না। টিউনিস্ নগরবাসী মুসলমানগণও এই যুদ্ধ ব্যাপারে নির্লিপ্ত ছিল না। সাধারণতঃ সমুদ্র-বক্ষে বাণিজ্যপোত লইয়াই এই সকল যুদ্ধ সংঘটিত হইত; অতএব এই গুলিকে যুদ্ধ না বলিয়া দস্যুবৃত্তি বলাই ভাল।

একদা কোন কার্য্যোপলক্ষে টিউনিস্ নগরে উপস্থিত হইয়া ইউবার্টো দেখিলেন, একটী তরুণবয়স্ক শ্বেতকায় পুরুষ শৃঙ্খলাবদ্ধ হইয়া ক্রীতদাসের কার্য্যে নিযুক্ত রহিয়াছে। দেখিয়াই ইউবার্টো বুঝিলেন যে ঐ হতভাগ্য যুবক খ্রীষ্টীয়ধর্ম্মাবলম্বী এবং ইটালীবাসী। তাঁহার ইহাও বুঝিতে বাঁকি রহিল না যে দৈবাৎ কোন

যুদ্ধে মুসলমান হস্তে পরাস্ত হইয়াই যুবক এই দুর্দ্দশা-গ্রস্ত হইয়াছে। যুবকের তাৎকালিক অবস্থা দৃষ্টে ইউবার্টোর স্পষ্টই প্রতীতি হইল যে তাহার শীর্ণ শরীরের পক্ষে সেই কঠোর পরিশ্রম একান্তই অসহনীয়। ক্ষণে ক্ষণে যুবক হস্তস্থ খননদণ্ডের উপর ভর দিয়া বিশ্রাম করিতেছিল। তাহার মর্ম্মভেদী দীর্ঘ নিশ্বাস ও আগণ্ডবাহি অশ্রুজল, তাহার গভীর হৃদয়বেদনার সাক্ষ্য দিতেছিল। উদারহৃদয় ইউবার্টো যুবকের তাদৃশী দুরবস্থা দর্শনে নিতান্ত কাতর হইলেন। অতএব আর বিলম্ব না করিয়া যুবককে ইটালী ভাষায় সম্বোধন পূর্ব্বক তাহার বর্ত্তমান বিপদের কারণ জিজ্ঞাসু হইলেন। বহুদিন পরে হতভাগ্য যুবক চিরপরিচিত মাতৃভাষার সুমিষ্ট স্বর শ্রবণে নিতান্ত ব্যগ্রচিত্তে ইউবার্টোর কথাগুলি শুনিতে লাগিল, এবং তাঁহার কথার প্রত্যুত্তর দিতে লাগিল। অল্প-ক্ষণ মধ্যেই ইউবার্টো বুঝিলেন যে এই হতভাগ্য যুবক জেনোয়ার সেই অহঙ্কারদৃপ্ত প্রধান বিচারক আদর্ণোর পুত্র! বলা বাহুল্য যে ইউবার্টো এই সংবাদে প্রথমে নিরতিশয় বিস্ময় সহকারে চমকিয়া উঠিলেন; কিন্তু মুহূর্ত্ত মধ্যে আত্মসংগোপন করিয়া দ্রুতগতি স্থানান্তর গমন করিলেন। হতভাগ্য যুবক তাহার প্রশ্নকর্ত্তার এতাদৃশ ব্যবহারের কোন

মর্ম্ম বুঝিতে না পারিয়া অবাক্ হইয়া দণ্ডায়মান রহিল।

এদিকে ইউবার্টো সর্ব্ব প্রথম ঐ যুবকের বর্ত্তমান প্রভুর অন্বেষণে বহির্গত হইলেন। ইনি একজন দস্যু-দলপতি। অচিরাৎ তাঁহার সাক্ষাৎকার লাভ করিয়া ইউবার্টো তাঁহাকে ঐ যুবকের স্বাধীনতার মূল্য জিজ্ঞাসা করিলেন। দস্যু-দলপতি জানিতেন, সেই যুবক সম্ভ্রান্ত ও সম্পন্ন পরিবারের সন্তান; অতএব যত ইচ্ছা অধিক মূল্য চাহিলেই পাওয়া যাইবে—এই বিশ্বাসে একেবারে অন্যূন দুই সহস্র ক্রাউন নামক মুদ্রা চাহিলেন। একটি ক্রাউনের মূল্য অন্ততঃ আড়াই টাকা; অতএব প্রায় পাঁচ হাজার টাকা চাওয়া হইল। যাহা হউক ইউবার্টো দ্বিরুক্তি ব্যতিরেকে তৎক্ষণাৎ প্রার্থিত অর্থ প্রদান করিয়া যুবকের মুক্তি ক্রয় করিলেন। অনন্তর ভদ্রলোকোচিত একটী পরিচ্ছদ লইয়া ভৃত্যসহ অতি শীঘ্র ঐ হতভাগ্য যুবকের নিকট উপস্থিত হইলেন এবং তাঁহাকে তাহার দাসত্ব মোচনরূপ শুভ সংবাদ জ্ঞাপন করিলেন। ইউবার্টো স্বহস্তে যুবকের পদসংলগ্ন লৌহ-শৃঙ্খল উন্মোচন করিয়া তাহাকে নববেশে সজ্জিত করিলেন। এদিকে যুবকের নিকট এই আকস্মিক মহোপকার নিতান্তই স্বপ্নবৎ প্রতীয়মান হইল; তাহার কিছুতেই বিশ্বাস হইতেছিল না

যে সে প্রকৃতই মুক্তি লাভ করিয়াছে। কিন্তু অধিক-ক্ষণ তাহাকে এই সন্দিগ্ধাবস্থায় থাকিতে হইল না। ইউবার্টো তাহাকে অচিরাৎ স্বগৃহে আনয়ন করিয়া তাহার প্রতি বান্ধবোচিত সৎকার করিতে লাগিলেন। এতক্ষণে হতভাগার প্রত্যয় জন্মিল যে সে আর শৃঙ্খলাবদ্ধ দাস নহে, এখন সে ইউবার্টো তুল্য মুক্ত জীব।

পরদুঃখকাতর উন্নতহৃদয় ইউবার্টো অধিক দিন যুবককে স্বগৃহে রাখিলেন না। তিনি জানিতেন যে যুবকের বিরহে তাহার পিতা আদর্ণো অবশ্যই কষ্টে দিনাতিপাত করিতেছেন। অতএব উপযুক্ত সুযোগ সংঘটন মাত্র, তিনি যুবককে ইটালী-গামী এক খানি অর্ণব পোতে আরোহণ করাইলেন; জেনোয়ানগরী পর্য্যন্ত গমনের উপযুক্ত পাথেয় প্রদান করিলেন; এবং বিদায় কালে যুবককে বন্ধু ভাবে সম্বোধন করিয়া বলিতে লাগিলেন, "প্রিয় যুবক, তোমাকে আরও অনেক দিন আমি এখানে রাখিতে পারিতাম; কিন্তু আমি বুঝিতেছি তুমি পিতৃমাতৃসন্নিধানে প্রত্যা-বর্ত্তনের নিমিত্ত নিতান্ত ব্যগ্র হইয়াছ। সমুদ্র গমনের ব্যয় স্বরূপ এই কয়েকটী মুদ্রা গ্রহণ কর এবং এই পত্রিকা খানি তোমার পিতৃ হস্তে দান করিও। আমি তোমাকে শীঘ্র বিস্মৃত হইতে পারিবনা, আশা করি,

তুমিও আমাকে শীঘ্র ভুলিবে না। এখন বিদায়।" এই কথা গুলি বলিতে বলিতে ইউবার্টোর গণ্ড বহিয়া নয়ন-জল পতিত হইতেছিল; যুবক উপকারী বন্ধুর নিকট শত কথায় কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিতে লাগিল, তাহারও নয়নদ্বয় অশ্রুপরিপূর্ণ হইয়াছিল। অবশেষে পুনঃপুনঃ স্নেহালিঙ্গন প্রদানান্তর যুবককে জাহাজে রাখিয়া ইউ-বার্টো গৃহ প্রত্যাগমন করিলেন। যুবক যথাসময়ে জেনোয়া উপস্থিত হইল।

এ দিকে যুবকের পিতা মাতা আদর্ণো ও তাঁহার স্ত্রী, যুবকের প্রত্যাগমনে বহু বিলম্ব দেখিয়া ভাবিয়া-ছিলেন, হয়ত কোনও রূপে জাহাজ জলমগ্ন হওযায় তাঁহাদের পুত্র সমুদ্রগর্ভে প্রাণত্যাগ করিয়াছে। অতএব তাঁহারা পুত্রের জীবনাশা একেবারে পরিত্যাগ করিয়া শোকে কালাতিপাত করিতেছিলেন। এখন সহসা পুত্রকে দেখিয়া তাঁহাদের হৃদয়ের কি অবস্থা হইল তাহা বর্ণনাতীত। তাঁহাদের গভীর শোক এখন নিরতিশয় আনন্দে পরিণত হইল; আনন্দোচ্ছ্বাস বশতঃ বহুক্ষণ তাঁহাদের বাক্যস্ফূর্ত্তি হইল না; তাঁহারা পুত্রকে দৃঢ়া-লিঙ্গনে হৃদয়ে চাপিয়া রাখিলেন তৎকালীন আনন্দো-চ্ছ্বাস কিয়ৎ পরিমাণে প্রশমিত হইলে, যুবক তাহার দস্যু হস্তে পতন ও দাসত্বে নিয়োগ প্রভৃতি এতাধিক বিলম্বের হেতু জ্ঞাপন করিলেন। তখন আদর্ণো সোৎ-

সুকচিত্তে জিজ্ঞাসা করিলেন "পুত্র, তোমার মুক্তি স্বরূপ এই অমূল্য উপকারের জন্য আমি কাহার নিকট ঋণী ?" যুবক পিতৃ হস্তে একখানি পত্র দিয়া বলিল "পিতঃ, এই পত্র পাঠে সমস্ত অবগত হইতে পারিবেন।" আদর্ণো পত্র পড়িতে লাগিলেন। উহাতে এইরূপ লেখা ছিল— 'আদর্ণো, তোমার কি মনে পড়ে, একদিন তুমি কোনও পরাজিত শত্রুকে নীচ সূত্রধর পুত্র বলিয়া সর্ব্বসমক্ষে অপমানিত করিয়াছিলে ? তোমার কি মনে পড়ে, সেই সূত্রধর পুত্র তোমাকে বলিয়াছিল যে হয়তো একদিন সেই রূঢ় ভাষার জন্য তোমাকে অনুতপ্ত হইতে হইবে ? অদ্য ভগবানের কৃপায় সেই সূত্রধর-পুত্রের ভবিষ্যদ্বাণী সফল হইয়াছে। কারণ, হে গর্ব্বিত আদর্ণো, তুমি অদ্য অবগত হও যে তোমার একমাত্র পুত্রের ত্রাণকর্ত্তা

সেই নির্ব্বাসিত ইউবার্টো।"

পত্র খানি আদর্ণোর কম্পমান হস্ত হইতে ভূপতিত হইল। লজ্জায় ও অভিমানে তাঁহার হৃদয়ে শোণিত-তরঙ্গাভিঘাত হইতে লাগিল। তিনি হস্তদ্বারা মুখাবৃত করিয়া রহিলেন। এদিকে তাঁহার পুত্র ক্রমাগত ইউবার্টোর নানাবিধ গুণের প্রশংসা করিতে

লগিল। ইউবার্টোর গৃহে যুবক কিরূপ সাদরে গৃহীত ও প্রতিপালিত হইয়াছিল এবং ইউবার্টো তাহার প্রতি কিরূপ প্রকৃত পিতৃস্নেহ প্রদর্শন করিয়াছিলেন, সমস্তই যুবক একে একে বর্ণনা করিল। আদর্ণো দেখিলেন ইউবার্টোরই প্রকৃত জয়লাভ হইয়াছে; তিনি যে বৃথা জন্ম গৌরব বশতঃ মোহান্ধ হইয়া ইউবার্টোকে নীচ বংশীয় বলিয়া অপমান করিয়াছিলেন, তাহা নিতান্তই অন্যায় হইয়াছিল। তিনি আরও বুঝিতে পারিলেন যে নীচ বংশীয় হইলেও ইউবার্টোর হৃদয়ে যে উচ্চতা বর্ত্তমান, তাহা উচ্চ বংশাভিমানীদিগের মধ্যেও সুদুর্লভ। এই সকল চিন্তা করিতে করিতে আদর্ণোর হৃদয় ক্রমেই ইউবার্টোর দিকে আকৃষ্ট [illegible] পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে যে আদর্ণো স্বভাবতঃ অনুদার [illegible] প্রকৃতির লোক ছিলেন না, [illegible] ঘটনায় তাঁহার বিশেষ উপকার [illegible] নের পরিবর্ত্তে [illegible] র পরিবর্ত্তে প্রত্যুপকারেচ্ছা [illegible] দয়ে জাগরিত হইল। তিনি আর স্থির থাকিতে পারিলেন না; কিরূপে ইউবার্টোর প্রতি কৃত পাপের [illegible] সাধনে সমর্থ হইবেন, তচ্চিন্তায় মগ্ন হইলেন। তিনি জেনোয়ার শাসনকর্ত্তাদিগের নিকট গমন করিয়া ইউবার্টোর নির্ব্বাসন দণ্ড

রহিত করিবার জন্য বিশেষ অনুনয় করিলেন। তাঁহারা আদর্ণোর এই প্রার্থনা অগ্রাহ্য করিতে পারিলেন না; বিশেষতঃ এতদিন পরে সকলেরই হৃদয়ে পূর্ব্বঘটনার স্মৃতি ও তজ্জনিত প্রতিহিংসার ভাব লুপ্ত হইয়া আসিয়াছিল। অনতিবিলম্বে আদর্ণো ইউবার্টোকে পত্র দ্বারা জানাইলেন যে ইউবার্টো গৃহাগমনের অনুজ্ঞাপ্রাপ্ত হইয়াছেন এবং তিনি পুনরায় জেনোয়াবাসী বলিয়া পরিগণিত হইয়াছেন। বলা বাহুল্য পত্রে আদর্ণো ইউবার্টোর নিকট শত কৃতজ্ঞতা জানাইলেন; পূর্ব্বাপরাধের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করিয়া ইউবার্টোর সহিত বন্ধুতা প্রার্থী হইলেন। যথা সময়ে ইউবার্টো গৃহ প্রত্যাগমন করিলেন; এবং সর্ব্ব সাধারণের সম্মানভাজন হইয়া জীবনের অবশিষ্টাংশ সুখে অতিবাহিত করিলেন!

তাঁহারাই প্রকৃত মহৎ; যাঁহারা সাধুতার দ্বারা অসাধুতাকে পরাজয় করিতে পারেন।

সাহসী বালক।

হে সুবোধ বালক বালিকাগণ, তোমরা সকলেই ইংলণ্ডের নাম শুনিয়াছ, কেননা ইংলণ্ডবাসী ইংরেজগণই এখন আমাদের রাজা। ইংরাজেরা যে কেবল এই দেশের রাজা তাহা নহে, পৃথিবীর ভিন্ন ভিন্ন স্থলবর্ত্তী বহুসংখ্যক দেশ তাঁহাদের অধিকৃত। বস্তুতঃ বর্ত্তমান সময়ে আর কোন জাতিই ইংরেজদিগের সমকক্ষ নহে। যে সকল কারণ বশতঃ ইংরাজেরা এত বড় হইয়াছেন, তন্মধ্যে একটা প্রধান কারণ এই যে, তাঁহাদের যত সুদৃঢ় রণ-তরণী ও সুশিক্ষিত নৌ-সৈন্য আছে, এরূপ অন্য কোন জাতির নাই। ইংলণ্ডে ভিন্ন ভিন্ন সময়ে, বহু সংখ্যক বীর পুরুষ জল-যুদ্ধে খ্যাতি লাভ করিয়া গিয়াছেন; কিন্তু যে বিখ্যাত জল-যোদ্ধার গুণে ইংলণ্ডের নৌ-সৈন্য জগতের ভয়াবহ হইয়াছে, আমরা এখানে সেই মহাবীরের বাল্যজীবনের কিঞ্চিৎ পরিচয় দিব।

এই মহাত্মার নাম হোরেসিয়ো নেলসন্। ইংলণ্ডের পূর্ব্বোপকূলস্থ নরফক্ প্রদেশের কোন গ্রামে, একটী দরিদ্র পুরোহিতের ঘরে, ১৭৫৮ খ্রীঃ অব্দে তাঁহার

জন্ম হয়। তাঁহার পিতার নাম এডমাণ্ড, মাতার নাম ক্যাথারিণ। নয় বৎসর বয়স অতীত হইতে না হইতেই বালক নেলসনের মাতৃ-বিয়োগ ঘটিল। নেলসনের অনেক গুলি ভাই ভগিনী ছিল। তাঁহার পিতা একে দরিদ্র, তাহার উপর পত্নী-বিয়োগ বশতঃ সন্তানসন্ততি লইয়া বড় বিপন্ন হইলেন। ঐ দুর্ঘটনার অল্প দিন পরেই নেলসনের মাতুল এই শোক-সন্তপ্ত পরিবারের সান্ত্বনার জন্য আসিয়া উপস্থিত হইলেন; এবং ভগিনী-পতির অর্থাভাব বুঝিয়া একটী বালকের প্রতিপালন ও শিক্ষার ভার লইতে স্বীকার করিলেন। এই মাতুলের নাম সাক্‌লিং; ইনি ইংলণ্ডরাজের রণতরির একজন কর্ম্মচারী ছিলেন।

উপরোক্ত ঘটনার তিন বৎসর পর যখন নেলসনের দ্বাদশবর্ষ বয়ঃক্রম, তখন একদিন তিনি সংবাদ পত্রে পাঠ করিলেন, যে তাঁহার মাতুলের পদোন্নতি হইয়াছে এবং তিনি একখানি প্রশস্ত রণতরিতে নিযুক্ত হইয়াছেন এই সংবাদ পাইয়া নেলসন সমুদ্র গমনে ইচ্ছুক হইলেন। ঐ সময়ে তাঁহার পিতা বাড়ী ছিলেন না; শারীরিক অসুস্থতা নিবন্ধন জলবায়ু পরিবর্ত্তনার্থ বাথ নামক নগরে গমন করিয়াছিলেন। অতএব নেলসন্ বাথ নগরে পিতাকে পত্র লিখিলেন এবং স্বীয় অভিলাষ জানাইলেন। নেলসনের পিতা অতিশয় বুদ্ধি-

মান্ ছিলেন ; তিনি পুত্রের চরিত্র ভাল রূপ বুঝিতে পারিয়াছিলেন। তাঁহার নিশ্চিত ধারণা হইয়াছিল, যে হোরেসিও যে কোন অবস্থায় স্থাপিত হউন না কেন, তিনি হয়তো একদিন সকলের শীর্ষ স্থান অধিকার করিবেন। তিনি ইহাও বুঝিতে পারিলেন, যে হোরেসিও পারিবারিক দুরবস্থা দেখিয়া, স্বীয় উন্নতি মানসেই এইরূপ দুঃসাহসিক কার্য্যে অভিলাষী হইয়াছেন। অতএব তিনি পুত্রের সংকল্পের বিরুদ্ধাচরণ করিলেন না। পুত্রের মাতুলের নিকট পত্র দ্বারা পুত্রের অভিপ্রায় জানাইলেন এবং তৎকর্ত্তৃক পূর্ব্বকৃত অঙ্গীকার উল্লেখ করিলেন। তদুত্তরে মাতুল সাকলিং এইরূপ ব্যঙ্গোক্তিপূর্ণ পত্র লিখিলেন। "মহাশয়, দুর্ব্বল হোরেসিও এমন কি অপরাধ করিয়াছে, যে আপনি তার সকল পুত্র ছাড়িয়া, তাহাকেই এই দুঃখময় সামুদ্রিক জীবন যাপন জন্য মনোনীত করিলেন ? যাহা হউক তাহাকে পাঠাইয়া দিবেন ; প্রথম যুদ্ধেই কামানের গোলায় তাহার মস্তক উড়িয়া গেলে, অবিলম্বে তাহার ভরণপোষণের ভালরূপ বন্দোবস্ত হইবে।"

এই কয়টী কথা পাঠে স্পষ্টই জানা যায়, যে তাঁহার মাতুলের বিবেচনায়, নৌযুদ্ধবিদ্যা-শিক্ষার পক্ষে হোরেসিও একেবারে অনুপযুক্ত ছিলেন। তাঁহার

এইরূপ বিবেচনার যথেষ্ট কারণও বর্ত্তমান ছিল। হোরেসিও স্বভাবতঃই দুর্ব্বল-শরীর ছিলেন; তাহার উপর আবার পুনঃ পুনঃ এক প্রকার জ্বর রোগে অতি মাত্র দুর্ব্বল হইয়া পড়িয়াছিলেন। ঐ সময়ে ইংলণ্ডে এই জ্বরের অত্যন্ত প্রাদুর্ভাব ছিল। কিন্তু শারীরিক দুর্ব্বলতা সত্ত্বেও তাঁহার হৃদয় সাহসে ও মন উদারতায় পরিপূর্ণ ছিল। ইহার প্রমাণও পূর্ব্বোক্ত ঘটনার পূর্ব্বেই পাওয়া গিয়াছিল।

অতি শৈশবকালে, একদা তিনি একটী অল্পবয়স্ক রাখালের সহিত, পাখীর বাসা অন্বেষণে, গৃহ হইতে বহির্গত হইলেন। আহারের সময় অতিক্রান্ত হইয়া গেল, তবুও তিনি ফিরিলেন না। অনুসন্ধানেও তাঁহাকে পাওয়া গেল না। বাড়ীর সকলেই নিতান্ত ব্যস্ত হইয়া উঠিলেন। সকলেরই আশঙ্কা হইতে লাগিল, হয়তো তিনি কোন ছেলেধরা চোরের হাতে পড়িয়াছেন। আমাদের দেশে যেমন "ছেলেধরা" চোরের কথা শুনা যায়, ইংলণ্ডেও সেইরূপ চোরের উপদ্রব ছিল। যাহা হউক চারিদিকে অনেক অনুসন্ধানের পর দেখা গেল, যে শিশু হোরেসিও একাকী একটী ক্ষুদ্র জল-স্রোতের নিকট বসিয়া রহিয়াছেন। তাঁহার মুখে কোনও ভীতি-লক্ষণ দৃষ্ট হইল না। বৃদ্ধা দিদিমা তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি আশ্চর্য্য! তোমার

কি ক্ষুধা তৃষ্ণা নাই? এইরূপ জঙ্গলে বেড়াইতে তোমার কি কোন ভয় হয় না? ভয় পাইয়াও কি একবার বাড়ীর কথা মনে করিলে না?” শিশু উত্তর করিলেন, “দিদি মা! ভয় পদার্থটা কি? আমিত কখন তাহাকে দেখি নাই! সে কিরূপ?”

ইংলণ্ড অতিশয় শীত প্রধান দেশ। আমাদের দেশে শীত কালে শিশিরপাত সকলেই দেখিয়াছেন। ইংলণ্ডে শীতকাল বড়ই ভয়ানক। তথায় তখন অবিরত তুষার-পাত হয়। বায়ুরাসের সহিত যে জলকণা মিশ্রিত আছে, তাহা শীতের প্রভাবে জমিয়া অতি সূক্ষ্মসূত্র-খণ্ডবৎ, কিম্বা নিতান্ত সরু পর্দার মত হইয়া, স্তরে স্তরে মৃত্তিকায় পতিত হয়। ঐ তুষার দেখিতে অতি শুভ্র। কখন কখন এত অধিক তুষারপাত হয়, যে দেশের পথ-ঘাট সমস্ত আবৃত হইয়া যায়; পথে বাহির হইলে জানু পর্য্যন্ত তুষার নিমগ্ন হয়। এই সময়ে পথচলা অতি দুষ্কর; সাধারণতঃ তখন দ্বারাবরোধ পূর্ব্বক গৃহ মধ্যে বসিয়া থাকিতে হয়। আমাদের দেশে যেমন গ্রীষ্মাতি-শয্য-বশতঃ, বিদ্যালয় সমূহ কিছু দিনের জন্য বন্ধ থাকে, ঐ দেশে শীতকালে বিদ্যালয় সমূহ বহু দিনের জন্য বন্ধ হয়। একবার শীতাবকাশের পর বালক হোরেসিও তাঁহার অগ্রজ উইলিয়মের সহিত অশ্বারোহণে বিদ্যা-লয়ে যাইবার জন্য যাত্রা করিলেন। ঐ বিদ্যালয়

আমাদের দেশের বিদ্যালয়ের মত নহে। আমরা যেমন বাড়ীতে থাকি, কেবল ১১টা হইতে ৪টা পর্য্যন্ত বিদ্যালয়ে যাইয়া পড়া দিয়া আসি; ইংলণ্ডে সাধারণতঃ সেরূপ নহে। তথায় বিদ্যালয়ের সহিত ছাত্রাবাস আছে; উহাকে ইংরাজিতে বোর্ডিংস্কুল কহে। এখানে ছাত্রদিগকে ২৪ ঘণ্টাই শিক্ষকদের তত্ত্বাবধানে থাকিতে হয়। কেবল কোন দীর্ঘ বন্ধোপলক্ষে ছাত্রেরা গৃহে যাইতে অনুমতি প্রাপ্ত হয়। হোরেসিও ও উইলিয়ম এইরূপ বিদ্যালয়েই পাঠ করিতেন। যাহা হউক তাঁহারা বাড়ী হইতে যাত্রা করিয়া কিয়দ্দূর গমন করিতে না করিতেই দেখিলেন, পথে অত্যন্ত তুষারপাত হইয়াছে, চলা কষ্টসাধ্য, কাজেই তাঁহারা গৃহ প্রত্যাগমন করিলেন। উইলিয়মের বিদ্যালয়ে যাইবার বড় ইচ্ছা ছিল না; তিনি পিতাকে জানাইলেন, এত অধিক তুষারপাত হইয়াছে যে তাঁহাদের পক্ষে ঐ সময় পথ ভ্রমণ নিরাপদ নহে। পিতা উত্তর করিলেন, "যদি প্রকৃতই ঐরূপ হইয়া থাকে, তবে তোমাদিগকে আজ যাইতে হইবে না; কিন্তু আর একবার চেষ্টা করিয়া দেখ। তোমাদের আত্মসম্মান জ্ঞানের উপরেই, আমি এ বিষয়ের সম্পূর্ণ ভার দিলাম। যদি অদ্য পথের অবস্থা প্রকৃতই বিপদসঙ্কুল হইয়া থাকে, তোমরা ফিরিয়া আসিতে পার; কিন্তু, বালকগণ, মনে রাখিও যে তোমাদিগকে বিশ্বাস

করিয়াই এ বিষয়ের ভার তোমাদের উপর দিলাম; দেখিও আমার বিশ্বাসের অপব্যহার করিও না।” বালকদ্বয় পুনরায় যাত্রা করিলেন। প্রকৃতই সেই দিন পথ একেবারে তুষারাবৃত ছিল, অতএব তাঁহাদের পুনঃ প্রত্যাগমনের হেতুও ছিল। উইলিয়মেরও ইচ্ছা, ফিরিয়া যান; এবং তজ্জন্য হোরেসিওকে পুনঃ পুনঃ অনুরোধ করিলেন। তখন উন্নতহৃদয়, সাহসী বালক হোরেসিও উত্তর করিলেন, “দাদা, আজ ফিরিতে পারি না, আজ আমাদিগকে চলিতেই হইবে; কারণ বাবা আমাদিগের আত্ম সম্মানজ্ঞানের উপর এ বিষয়ের ভার দিয়াছেন। আমি বুঝিতেছি যে অদ্য অথ চলিতে সমূহ কষ্ট হইতে পারে, কিন্তু কোন বিপদের আশঙ্কা নাই। আজ দেখাইব যে আমরা বাবার বিশ্বাসের উপযুক্ত।” অগ্রজ উইলিয়ম আর কথা বলিলেন না। উভয়ে যথাসময়ে বিদ্যালয়ে উপস্থিত ইইলেন।

ক্রমে হোরেসিওর সমুদ্র গমনের আদেশ আসিয়া পৌঁছিল। তিনি বিদ্যালয় হইতে গৃহে আনীত হইলেন। তথা হইতে পিতৃ-সমভিব্যহারে রাজধানী লণ্ডন নগরে উপস্থিত হইলেন। যে জাহাজে হোরেসিওর মাতুল কার্য্য করিতেন, ঐ জাহাজ লণ্ডন হইতে বহুদূরে অপেক্ষা করিতেছিল। হোরেসিওর পিতা

বালকটীকে সঙ্গে করিয়া জাহাজে পৌঁছাইয়া দিয়া আসা আবশ্যক মনে করিলেন না। হোরেসিও অন্যান্য পথিকসহ শকটারোহণ গন্তব্য স্থানে চলিলেন। শকট যথাস্থানে উপস্থিত হইলে, অন্যান্য পথিকের সহিত তিনিও অবতরণ করিলেন; পথিকেরা স্বীয় স্বীয় প্রয়োজন মত গন্তব্য স্থানে চলিয়া গেল। এদিকে হোরেসিও একাকী জাহাজ অনুসন্ধান করিয়া বেড়াইতে লাগিলেন। হোরেসিও যেখানে অবতরণ করিয়া, তাঁহার মাতুলের জাহাজ অনুসন্ধান করিতেছিলেন, ঐ স্থানটী রণতরি নির্ম্মাণের একটী প্রধান আড্ডা। তথায় সর্ব্বদাই বহুসংখ্যক, নানাবিধ, অর্ণবপোত অবস্থান করিত। বালক হোরেসিও বহু চেষ্টাতেও স্বীয় মাতুলের জাহাজের কোন নির্ণয় করিতে পারিলেন না। শীতপ্রধান দেশে, অনাবৃত নদীতীরে, একাকী ঘুরিতে ঘুরিতে, বালক কি ভাবিতে ছিলেন, তাহা বর্ণনাতীত। বহুক্ষণ পরে তাঁহার বিষাদ-ক্লিষ্ট মুখশ্রী দেখিয়া, জনৈক ভদ্রলোক তাঁহার পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলেন। বালকের সৌভাগ্য বশতঃ তাঁহার মাতুল কাপ্তান সাকলিংএর সহিত ঐ ভদ্রলোকটীর পরিচয় ছিল। অতএব ঐ ভদ্রলোকটী হোরেসিওকে সঙ্গে করিয়া, স্বীয় গৃহে লইয়া গেলেন; বালককে ক্ষুধার্ত্ত

জানিয়া, তাঁহাকে জলযোগ করাইলেন; এবং অবশেষে তাঁহাকে জাহাজে উঠাইয়া দিলেন। কিন্তু এখানেই হোরেসিওর দুঃখের অবসান হইল না। জাহাজে যাইয়া তিনি মাতুলের দেখা পাইলেন না; কাপ্তান সাকলিং সেই দিন জাহাজ হইতে কার্য্যোপলক্ষে কোথায়ও গমন করিয়াছিলেন; কিন্তু হোরেসিওর যে আসিবার কথা ছিল, তাহা কাহাকেও বলিয়া যান নাই। বালক সারাদিন জাহাজের "ডেকের" উপর পাদচারণ করিয়া সময় কর্ত্তন করিলেন; কেহ তাঁহাকে একটী কথাও জিজ্ঞাসা করিল না। রাত্রি আসিল; রাত্রিও ঐ ভাবে কাটিয়া গেল। পরদিন জাহাজের একজন লোক দয়াপরবশ হইয়া, তাঁহার তত্ত্বানুসন্ধান করিল।

হোরেসিও এক রূপ গ্রাম্য বালক ছিলেন; পূর্ব্বে কখন বৃহৎ নগর, কি বহু অর্ণবপোতের আশ্রয় বৃহৎ বন্দর দেখিয়াছিলেন কি না সন্দেহ। অথচ নিতান্ত নিরাশ্রয়ভাবে একাকী লণ্ডন হইতে বহুদূরে আসিয়া, মাতুলের অনুসন্ধান পূর্ব্বক, নানা বিঘ্নের পর, মাতুলের সাক্ষাৎকার লাভ করিলেন। হেরেসিও উত্তরকালে নাবিক জীবনের চরমোন্নতি লাভ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন, কিন্তু শত উন্নতি, শত সুখ সুবিধার মধ্যেও, বাল্যকালের ভ্রাতৃ ও পিতৃ বিচ্ছেদের পরেই, সমুদ্র-

গমনের এই প্রাথমিক দুঃখের কথা, কখনও বিস্মৃত হইতে পারেন নাই।

অধ্যবসায় ও সহিষ্ণুতা।

কোন কার্য্যারম্ভের পর কার্য্য-অসমাপ্তি পর্য্যন্ত, দৃঢ়তার সহিত তৎকার্য্যে নিযুক্ত থাকা, এবং বাধাবিঘ্ন সত্ত্বেও অবলম্বিতকার্য্যসাধনে, ঐকান্তিক যত্ন ও অবিচলিত উৎসাহ প্রদানকে, অধ্যবসায় বলা যাইতে পারে। অধ্যবসায়কে প্রাণী কল্পনা করিলে, উৎসাহকে ইহার প্রাণ, অবিচ্ছেদ চেষ্টা যত্নকে ইহার পদ, অকাতর পরিশ্রমকে ইহার হস্ত, এবং সহিষ্ণুতাকে ইহার আরামদায়িনী, নিত্যসহচরী ভাবে গ্রহণ করা যাইতে পারে। আরব্ধ কার্য্য আমার মঙ্গলজনক, এবং তাহাতে আমি নিশ্চয়ই সফল হইব, এই বিশ্বাসের দ্বারা, মন দৃঢ়ীভূত হইলে, ভাবী মঙ্গললাভের আশাজনিত একটী সন্তোষের ভাবে মানবহৃদয় পূর্ণ হয়। এই সন্তোষের সঙ্গে সঙ্গেই একটী উত্তেজনার ভাব আসিয়া উপস্থিত হয়। তখন মানুষ চেষ্টা, যত্ন, ও পরিশ্রম সাহায্যে কার্য্যসাধনে তৎপর হয়। অতএব এই আনন্দমিশ্রিত উত্তেজনা ভিন্ন, অধ্যবসায় সজীব থাকিতে পারে না।

অধ্যবসায়ের সজীবতার তারতম্য, পূর্ব্বোক্ত বিশ্বাসের ও এই সানন্দ উত্তেজনার মাত্রাভেদের উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করে। যাহার হৃদয়ে, স্বীয় কার্য্যের উপ-কারিতা বিষয়ে বিশ্বাস নিতান্ত ক্ষীণ, যে এখনও প্রারব্ধ কার্য্যের সফলতা বিষয়ে সংশয়াবদ্ধ, তাহার প্রাণে কখনই সেই মহামোহকরী উত্তেজনা জন্মিতে পারে না, যাহার বলে মানব স্বকার্য্য-সাধনে কখন বা সর্প বিবরে, কখন বা সিংহ গুহায় প্রবেশ করিতেছে; কখন বা উত্তুঙ্গ গিরিশৃঙ্গে আরোহণ কখন বা গভীর সমুদ্র-গর্ভে অবরোহণ করিতেছে। এই জগতীতলে মানবে মানবে যে এত প্রভেদ, তাহার একটী প্রধান কারণ, এই বিশ্বাসের তারতম্য।

এই সংসারের কার্য্যকলাপ, ইহার পরিচালক প্রাকৃ-তিক নিয়ম প্রভৃতি নিতান্তই রহস্যময়। এই রহস্যময় জগতে আমরা নিরন্তর দেখিতে পাইতেছি, মানবের ইচ্ছা ও কার্য্য-শক্তি সমদূরবর্ত্তিনী হইতেছে না। আমরা আরও দেখিতে পাইতেছি যে, যে কার্য্যকে আমাদের সম্পূর্ণ সাধ্যায়ত্ত মনে করিতেছি, যাহা আমাদের চক্ষের সম্মুখে, আর দশজনে অতি সহজে করিয়াছে বা করি-তেছে, এমন কার্য্য করিতে গিয়াও সফলমনোরথ হইতে পারিতেছি না; কোথা হইতে অভাবনীয় বিঘ্ন আসিয়া আমাদের সকল চেষ্টা, সকল আয়োজন, মুহূর্ত্তে

অধ্যে বিফল করিয়া দিতেছে। এবম্বিধ অবস্থায় আমাদের উপায় কি? আমাদের অবলম্বন কোথায়? সর্ব্বকালে, সর্ব্বাবস্থায়, আমাদের প্রধান অবলম্বন, আশা ও সহিষ্ণুতা। মানব, তুমি নিরন্তর পরিশ্রমে একান্ত ক্লান্ত হইয়া, একেবারে ভগ্ন-শরীর হইয়া পড়িয়াছ? উপর্য্যুপরি বিপৎপাতে ও শত বিঘ্ন বাধায় নিতান্ত পীড়িত হইয়া, ভাবী ফললাভে একান্ত সন্দিহান্ হইতেছ? কার্য্য পরিত্যাগ পূর্ব্বক পৃষ্ঠভঙ্গ দিতে ইচ্ছা করিতেছ? প্রকৃতই তোমার এখন সমূহ বিপদ উপস্থিত; এই বিপদে তোমার সহায় কে? এখন তুমি একবার ক্ষণকাল চিত্তসংযম করিয়া শ্রবণ কর, তোমার কর্ণে কে কি বলিতেছে? ঐ শোন, আশা স্পষ্ট ভাষায় তোমাকে কার্য্যপরিহারে পুনঃ পুনঃ নিষেধ করিতেছে; ঐ শোন, তোমাকে চির-শান্তিদায়িনী সহিষ্ণুতার ক্রোড়ে আশ্রয় গ্রহণ করিতে, নির্ব্বন্ধাতিশয় সহকারে পরামর্শ দিতেছে। মানব, তুমি এই নিষেধ অবহেলা করিও না, এই পরামর্শবাক্যে বধির হইও না। তুমি বলিতেছ—এই ত কত দিন আশার কুহকে পড়িয়া কত কষ্ট সহিলাম; আর না, আর পারি না। আমি বলি, তুমি মূর্খ, প্রকৃত সহিষ্ণুতা কি পদার্থ, তাহা তোমার এখনও বোধগম্য হয় নাই। সহিষ্ণুতার আশ্রয়ে আসিয়া কে কোথায়

কষ্ট পাইয়াছে? সহিষ্ণুতাকে যে অবলম্বন করিয়াছে, তাহার যন্ত্রণা-বোধ শক্তি পর্য্যন্ত বিলুপ্ত হইয়াছে। তাহাকে কষ্ট দিতে পারে এমন কোন পদার্থ ইহ জগতে নাই। ঐ দেখ, রোগী শয্যায় পড়িয়া রোগ-যন্ত্রণায় "ছট্‌ফট্‌" করিতেছে, চিকিৎসক শত চেষ্টা করিয়াও যন্ত্রণা উপশমের কোন বিধান করিতে পারিতেছেন না; সমদুঃখী আত্মীয় বন্ধু বান্ধব শয্যার চারি-পার্শ্বে থাকিয়া কত চেষ্টাই করিতেছেন, কিন্তু যন্ত্রণার বিরাম নাই। এমন সময় রোগী যদি একবার মনকে বুঝাইতে পারে, যে এই "ছট্‌ফট্‌" হা হুতাশ প্রভৃতিতে যন্ত্রণা বাড়িবে বই ত কমিবে না, একবার সহিয়া থাকিতে পারি কি না দেখি—যেই এইরূপ চিন্তা ও তৎসহ চেষ্টা, অমনি যন্ত্রণার বিরাম, এবং যতক্ষণ মনের সেই ভাব স্থায়ী হইবে, ততক্ষণ আর যন্ত্রণার কোন সংস্রবই থাকিবে না। নিম্নগামী লোষ্ট্রখণ্ডের বেগ যেমন প্রতিমুহূর্ত্তে বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়, সেই-রূপ সহিষ্ণু ব্যক্তির হৃদয়ে এই সহিষ্ণুতার বলও প্রতিমুহূর্ত্তে সম্যক্‌ বর্দ্ধিত হয়। মনের এই বিস্ময়কর ভাব ভাষায় ব্যক্ত হয় না; অনুসন্ধিৎসু ব্যক্তি মাত্রেই ইহা স্বীয় মনে প্রণিধান করিতে পারেন। তাই বলিতেছিলাম, যাহার ধৈর্য্যবল আছে, তাহার সকল বিপদ, সকল জঞ্জাল, সকল

যন্ত্রণা দূরীভূত হইয়াছে। অতএব যিনি এই জগতে কোন কার্য্য করিতে অভিলাষী হইয়াছেন, তাঁহাকে নিরন্তর এই সহিষ্ণুতার আশ্রয় গ্রহণ করিতে হইবে। তাঁহার এই বিশ্বাস দৃঢ় থাকা উচিত, যে দুই দিনে হউক, দশদিনে হউক, উপযুক্ত সময়ে কার্য্যের ফল ফলিবেই ফলিবে; তিনি কেবল অনুষ্ঠান করিয়াই যাইবেন এবং সহিষ্ণুতার সহিত ফলাপেক্ষী হইয়া থাকিবেন মাত্র; যদি এই ভাবে এই পার্থিক জীবন অতিবাহিত হইয়াও যায়, তাহাতেই বা ক্ষতি কি? কারণ এই পৃথিবীতে কয়জন ব্যক্তি স্বরোপিত বৃক্ষের ফলাস্বাদনে সমর্থ হইয়াছে?

এই জগতে যেখানে যে মহৎ কার্য্য সাধিত হইয়াছে, তাহার মূলে চিরদিনই এই অধ্যবসায় ও সহিষ্ণুতা। যিনি প্রাতরুত্থানের সহিত কোন কার্য্যের সঙ্কল্প করিয়া সূর্য্যোদয়ের সহিত কার্য্যারম্ভ পূর্ব্বক, সূর্য্যাস্তের পূর্ব্বেই তৎফল সম্ভোগে অসমর্থ হইয়া নিরাশ হৃদয়ে কার্য্য পরাঙ্মুখ হয়েন, তিনি নিতান্ত তরলমতি, সৃষ্টি-রহস্যানভিজ্ঞ ঘোর কাপুরুষ; তাঁহার দ্বারা কোন কার্য্যই সম্পন্ন হইবে না; জীবন সংগ্রামে তিনি সর্ব্বপশ্চাতে পড়িয়া থাকিবেন। একটী গল্প আছে, যে কোনও বালক মৃত্তিকায় একটী বীজ রোপণ করিয়া, প্রত্যহ প্রাতে একবার বীজটী উঠাইয়া

দেখিত কতদূর অঙ্কুর হইয়াছে; কয়দিন এইরূপ করিতে করিতে দেখিতে পাইল, যে অঙ্কুর হওয়া দূরে থাকুক, বীজটাই নষ্ট হইয়া গিয়াছে। এই অসহিষ্ণু বালকের মত জীবন-সংগ্রামে অসহিষ্ণু ব্যক্তিদিগেরও চিরদিনই বিফল মনোরথ হইতে হইয়াছে। মানব, যদি তুমি সহিষ্ণুতার দৃষ্টান্ত না দেখিয়া থাক, তবে সর্ব্বাগ্রে তোমার পদতলস্থিত ধরিত্রীর ও তদুপরিস্থ অগণ্য জীবোদ্ভিদ্ পুঞ্জের বিষয় একবার চিন্তা করিয়া দেখ। তুমি কি জান, তুমি যে ভূস্তরের উপর দণ্ডায়মান রহিয়াছ, তাহা f হইতে কত কোটী কোটী বৎসর লাগিয়াছে? একবার চিন্তা করিয়াছ, যে তোমার চতুর্দ্দিকস্থ পক্ষী, কীট, পতঙ্গ, পর্ব্বত, বৃক্ষ, লতা, প্রভৃতি বর্ত্তম. অবস্থায় পরিণত হইতে কত লক্ষ যুগের প্রয়োজন হইয়াছে? আর তুমি যে মানব এখন জীবজগতের শীর্ষস্থানীয়; তোমার এই কান্তিবিশিষ্ট দেহ, তোমার এই অত্যাশ্চর্য্য, অতি বিস্ময়কর মানসিক শক্তি, কিরূপে কতদিনে এত উৎকর্ষ লাভ করিয়াছে? এ সব বিষয় কি একবার চিন্তা করিয়াছ? যদি না করিয়া থাক, তবে একবার বৈজ্ঞানিকের নিকট গমন কর। তিনি তোমাকে বলিয়া দিবেন ও নানা সদ্-যুক্তির দ্বারা বুঝাইয়া দিবেন, যে তোমার দেহের এই

বর্ত্তমান অবস্থা প্রথমাবস্থা হইতে এত পৃথক, যে দুইটীকে এক জাতীয় বলিয়া সহজে বিশ্বাসই হইবে না। যেমন বটবৃক্ষে ও তাহার বীজে বাহ্যিক কোন সৌসাদৃশ্যই নাই, অথচ বালুকণা মত বীজ হইতে বহুদূর বিস্তৃত, শাখাপ্রশাখা-সমন্বিত বটবৃক্ষের উৎপত্তি; এই ঘটনা যত বিস্ময়কর, প্রাণিজগতের আদিম অবস্থা হইতে মানব নামক জীবের বর্ত্তমান অবস্থায় উন্নতি, তদপেক্ষাও শত সহস্রগুণে অধিক বিস্ময়কর। কিন্তু এই ব্যাপার এক দিনে সংঘটিত হয় নাই। ধীরে ধীরে কত লক্ষ বৎসর ধরিয়া যে এই কার্য্যে লিপ্ত আছেন, তাহা আমরা ধারণা ও উঠিতে পারি না। সর্ব্ব-শক্তিমতী প্রকৃতিরই যদি কার্য্যসাধনে এত ধীরতা ও সময়ের প্রয়োজন, তবে এই প্রকৃতির নিত্যশাসিত দাস হইয়াও, আমরা অবলম্বিত কার্য্যে কেন চঞ্চলতা দেখাইব ও তৎফললাভে বিলম্ব দেখিলেই কেন নিরুৎসাহ হইব?

ডিমস্থেনিস্।

মহাদেশ ইউরোপের দক্ষিণ প্রান্তে গ্রীস নামক একটী জনপদ আছে। এই দেশের প্রাচীন ইতিহাসের সহিত আমাদের ভারতবর্ষের পূর্ব্বকালের

ইতিহাসের অনেক সৌসাদৃশ্য দেখা যায়। পূর্ব্বকালে ভারতবর্ষ যেরূপ নানাবিষয়ে অতিশয় উন্নতি লাভ করিয়াছিল, সেইরূপ গ্রীসও এক সময়ে বহুবিষয়ে উন্নতির পরাকাষ্ঠা লাভ করিয়াছিল। যেমন এখন ভারতবর্ষের সকল বিষয়েই পূর্ব্বাপেক্ষা অনেক অবনতি, সেইরূপ গ্রীসেরও এখন আর পূর্ব্ব গৌরব কিছুই নাই। তবে এক বিষয়ে গ্রীস ভারতাপেক্ষা সৌভাগ্যশালী। ভারতভূমি বহুশতাব্দী পর্য্যন্ত পরাধীনতার শৃঙ্খলে বাঁধা রহিয়াছে; গ্রীস সেই শৃঙ্খল ছিন্ন করিয়া আবার স্বাধীনতা লাভে সমর্থ হইয়াছে। কিন্তু বর্ত্তমানকালে গ্রীস, ইটালী, মিসর, ভারতবর্ষ প্রভৃতি প্রাচীন দেশসমূহ পূর্ব্ব-গৌরবহীন হইলেও, অপক্ষপাতদর্শী জ্ঞানিজনের নিকট ইহাদের এখনও সম্মান রহিয়াছে। কারণ, যে জাতিসমূহ এখন সভ্যতার উচ্চসীমায় আরোহণ করিয়া, জগতের কর্তৃত্ব আপনাদের মধ্যে বিভাগ করিয়া লইয়াছেন, তাঁহাদের বর্ত্তমান সর্ব্ববিধ উন্নতির মূলে অল্পাধিক পরিমাণে আমরা পূর্ব্বোক্ত প্রাচীন দেশবাসী জাতিসমূহের দৃষ্টান্তই দেখিতে পাই।

প্রায় সার্দ্ধদ্বিসহস্র বৎসর গত হইল এই গ্রীস দেশের রাজধানী এথেন্স নগরে কোন ধনীর গৃহে ডিমস্থেনিসের জন্ম হয়। ইঁহার চরিত্রে যে অসাধারণ

অধ্যবসায়ের পরিচয় পাওয়া যায়, তাহা মনুষ্য-মাত্রেরই অনুকরণীয়। অতি শৈশবকালে তাঁহার পিতৃবিয়োগ হয়। পিতৃবিয়োগের পর আত্মীয় বন্ধুগণ তাঁহার সহিত বড় অন্যায় ব্যবহার করিয়াছিলেন। তাঁহাকে প্রতিপালন করা দূরে থাকুক, তাঁহারা ডিমস্থেনিসের পৈত্রিক সম্পত্তির অধিকাংশই আত্মসাৎ করিয়া বসিলেন। এদিকে ডিমস্থেনিস্ স্বীয় চেষ্টায় কিছু কিছু বিদ্যালাভ করিতে লাগিলেন। অতি বাল্যকালাবধি তাঁহার বক্তৃতা-শক্তি লাভের ইচ্ছা হইয়াছিল। তিনি এথেন্স নগরে বক্তাদিগের প্রতি সর্ব্ব সাধারণের গভীর সম্মান দেখিতে পাইতেন। তিনি আরও দেখিতে পাইতেন, যে বক্তৃতা শ্রবণে শ্রোতৃবর্গের মন কিরূপে অনির্ব্বচনীয় ভাবে, অলক্ষ্য শক্তির দ্বারা, নিতান্ত উদ্বেলিত হইয়া উঠিত। বক্তৃতার এই মোহিনী শক্তি দেখিয়া তিনি অন্য সর্ব্ববিধ পাঠ পরিত্যাগ পূর্ব্বক, এই বক্তৃতা-শক্তি পরিস্ফুটনের চেষ্টায় একান্ত রত হইলেন। এক জন বিখ্যাত বক্তার নিকট গমন করিয়া তাহার শিষ্যত্ব গ্রহণ করিলেন এবং গুরূপদেশ প্রাণপণে পালন করিতে লাগিলেন।

যখন তাহার ধারণা হইল যে উদ্দেশ্য সাধনে তিনি কিঞ্চিৎ সমর্থ হইয়াছেন, তখন অপহৃত পৈতৃক

বিত্ত উদ্ধারের জন্য ধর্ম্মাধিকরণে অভিযোগ করিলেন। অপহারক আত্মীয়দিগের বিরুদ্ধে, তিনি স্বয়ং তেজস্বিনী বক্তৃতায়, এরূপ সদ্‌যুক্তি সমূহপ্রদর্শন করিলেন যে বিচারে তাঁহারই জয় হইল, এবং তিনি তাঁহার পৈত্রিক সম্পত্তির অধিকাংশই পুনঃ প্রাপ্ত হইলেন। এই সময় তাঁহার বয়ঃক্রম সপ্তদশ বর্ষ মাত্র।

এই জয়োল্লাসে উৎফুল্ল হইয়া ডিমস্থেনিস্ এক দিন বৃহতী জনসাধারণ-সভায় বক্তৃতা প্রদান জন্য দণ্ডায়মান হইলেন। কিন্তু আজ জয়ের পরিবর্ত্তে পরাভব তাঁহার জন্য অপেক্ষা করিতেছিল। এই জনসাধারণ সভা অত্যুৎকৃষ্ট বক্তৃগণের বক্তৃতা শ্রবণে অভ্যস্ত ছিল; শ্রোতৃমণ্ডলী তাঁহার বক্তৃতা শুনিয়া প্রীতি লাভ করিল না। বিশেষতঃ তাঁহার বক্তৃতা প্রণালীও নিতান্ত দূষণীয় ছিল; তিনি নিজে তাহা বুঝিতে পারেন নাই। তাঁহার কণ্ঠস্বর অনুচ্চ ও অদূরগামী ছিল, সভামণ্ডপের সকলের কর্ণে উহা প্রবেশ করিল না। এতদ্ভিন্ন তাঁহার স্বর বড় কর্কশ ছিল; যাহাকে চলিত কথায় "মোটা আওয়াজ" বলে, তাঁহার স্বর ঐরূপ ছিল। তিনি এক নিশ্বাসে অনেক কথা বলিতে পারিতেন না, অথচ দীর্ঘ দীর্ঘ বাক্যে বক্তৃতা দিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন; কাজেই একটী বাক্য পরিসমাপ্তি করিতে, তাঁহাকে দুই তিনবার শ্বাস-গ্রহণ

করিতে হইতেছিল। ইত্যাদি দোষজড়িত বক্তৃতা শুনিতে শুনিতে শ্রোতৃমণ্ডলী অধীর হইয়া উঠিলেন; ক্রমে সভামণ্ডপের চারিদিক হইতে কলরব মিশ্রিত "হিস্, হিস্" ধ্বনি উত্থিত হইতে লাগিল, অনতি-বিলম্বে বক্তৃতা বন্ধ হইল। লজ্জায় ও অভিমানে ডিমস্থেনিস্ মৃতপ্রায় হইলেন; অবনত মস্তকে কোনও রূপে সভাগৃহ পরিত্যাগ করিয়া চলিলেন।

এই সুমহৎ দুঃখের অবস্থায় একজন বন্ধুর সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হইল। তাঁহার গভীর বিষাদের কারণ অবগত হইয়া, বন্ধু তাঁহাকে সঙ্কল্প-নিবৃত্ত হইতে নিষেধ করিলেন এবং বৃথা শোক পরিত্যাগ করিতে উপদেশ দিলেন। সৌভাগ্যবশতঃ এই বন্ধু নিজে একজন বিখ্যাত নাটকাভিনেতা ছিলেন। সুতরাং কথা দ্বারা কিরূপে লোকের মনাকর্ষণ করিতে হয়, তাহা বিশেষরূপে অবগত ছিলেন। তিনি ডিমস্থে-নিস্‌কে কয়েকটী শ্লোক পাঠ করিতে দিয়া, তাঁহার উচ্চারণ প্রভৃতির দোষ সমূহ বুঝিতে পারিলেন। তখন তন্নিবারণ বিষয়ে উপদেশ দিয়া তিনি ডিমস্থে-নিস্‌কে কতকগুলি সঙ্কেত বলিয়া দিলেন। এই উপদে-শের উপর নির্ভর করিয়া, ডিমস্থেনিস যে অলৌকিক অধ্যবসায় ও পরিশ্রমগুণে, স্বীয়াভীষ্ট লাভে সমর্থ হইয়াছিলেন, তৎপাঠে একেবারে চমৎকৃত হইতে

হয়। তদবলম্বিত প্রণালীর কিয়দংশ নিম্নে প্রদত্ত হইল।

তিনি কতকটা "তোঁতলা" ছিলেন, কয়েকটী অক্ষর স্পষ্ট উচ্চারণ করিতে পারিতেন না। এই জন্য তিনি মুখাভ্যন্তরে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রস্তরখণ্ড রাখিয়া উচ্চৈঃ-স্বরে পাঠ করিতেন। এই উপায়ে ক্রমে সকল অক্ষ-রেরই স্পষ্ট উচ্চারণ হইতে লাগিল।

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে তিনি এক নিশ্বাসে অধিক কথা বলিতে পারিতেন না। ইহা বক্তার পক্ষে একটী প্রধান দোষ। অতএব যাহাতে অধিক ক্ষণ নিশ্বাস রাখিতে পারেন, তিনি সেইরূপ চেষ্টা করিতে লাগিলেন। দুরারোহ স্থানে আরোহণ ও তথা হইতে অবরোহণ সময়ে আমাদিগকে বাধ্য হইয়া অনেকক্ষণ নিশ্বাস রাখিতে হয়। অতএব ডিম-স্থেনিস্ বক্তৃতা প্রদান ভাবে চীৎকার করিতে করিতে দুরারোহ শৈলপথে ভ্রমণ করিতে লাগিলেন। এই উপায়ে ক্রমে তাঁহার বহুক্ষণ নিশ্বাস রক্ষণে শক্তি জন্মিতে লাগিল; ক্রমে অতি সুদীর্ঘ বাক্যও এক নিশ্বাসে বলিতে সমর্থ হইলেন।

যাঁহারা বড় বড় নগরের বিষয় অবগত আছেন, তাঁহারাই জানেন যে এই সকল নগরের সাধারণ শ্রোতৃবর্গ "আদুরে ছেলের" মত নিতান্তই উচ্ছৃঙ্খল।

ইহাদের নিকট নির্ব্বিঘ্নে বক্তৃতা প্রদান বড় কঠিন ব্যাপার। কোন বিষয় একটু মনোমত না হইলেই শ্রোতৃবর্গ কলরব আরম্ভ করে; অনেক সময়ে বিনা-কারণে বক্তাকে অপদস্থ করিবার জন্যও অনেকে সভা-মধ্যে গোলযোগের সূত্রপাত করে। তদ্ভিন্ন সর্ব্বত্রই ভিন্ন ভিন্ন মতাবলম্বী লোক রহিয়াছে। যদি কোন বক্তার মত শ্রোতৃবর্গের অপ্রীতিকর হয়, তবে তখন তাহারা তুমুলকাণ্ড আরম্ভ করে। এই কলরব প্রভৃতি অসভ্যাচরণ দর্শনে, যদি কোন বক্তা ভীতি বা বিরক্তির ভাব প্রদর্শন করেন, তবে কলরব আরও বর্দ্ধিত হয়, ক্রমে বক্তৃতা বন্ধ হইয়া যায়। কিন্তু যদি বক্তা ঐ সকল বিষয়ে দৃক্‌পাত না করিয়া, কলরব হইতেও উচ্চতর স্বরে, একাদিক্রমে স্বীয় বক্তব্য বলিয়া যাইতে পারেন, তবে প্রায়ই তিনি শ্রোতৃবর্গের গণ্ডগোল নিবারণে সমর্থ হন। পূর্ব্বকালে গ্রীসেরও শ্রোতৃবর্গ এই সাধারণ দৃষ্টান্তের অন্তর্ভূত ছিল; এমন কি তথায় সাধারণ সভাসমিতিতে এই উচ্ছৃঙ্খলতার ভাব অত্যধিক মাত্রায় বিদ্যমান ছিল। অতএব চারিদিকে কলরব সত্ত্বেও কিরূপে বক্তৃতা প্রদান করিতে পারা যায়, তৎ-শিক্ষার জন্য ডিমস্‌থেনিস্ সমুদ্র তটে গমন করিতেন; এবং যখন বাত্যাভিঘাতে সমুদ্র তরঙ্গায়িত হইয়া ঘোর-তর গর্জ্জন করিতে থাকিত, তখন তিনি কণ্ঠস্বরকে

উচ্চতম সীমায় উঠাইয়া মহান্‌ সমুদ্রের নিকট প্রাণ ভরিয়া বক্তৃতা দিতেন। এই রূপে তিনি বক্তৃতা-কালে শ্রোতৃবর্গের কলরব উপেক্ষা করিতে শিখিতে লাগিলেন।

সকলেই অবগত আছেন যে যাত্রা বা নাটকা-ভিনয়ের সময় অভিনেতৃগণ অঙ্গভঙ্গি সহকারে অভি-নয় করিয়া থাকেন; এইরূপ অঙ্গভঙ্গি ব্যতিরেকে অভিনয় হৃদয়গ্রাহী হয় না। বক্তৃতাকালে বক্তৃগণও হস্ত পদাদি বিক্ষেপ ও চক্ষু ভঙ্গি প্রভৃতির দ্বারা, শ্রোতৃ-বর্গের হৃদয়ে বক্তব্য বিষয় দৃঢ়রূপে অঙ্কিত করিতে চেষ্টা করেন; বস্তুতঃ এই সময়োচিত অঙ্গভঙ্গি ব্যতীত বক্তৃতা কখনই উদ্দীপনা গুণ বিশিষ্ট হইতে পারে না। ডিমস্‌থেনিস্‌ এই অঙ্গভঙ্গি শিখিবার নিমিত্ত একখানি প্রকাণ্ড দর্পণের নিকট বক্তৃতাভিনয় করিতেন; এবং প্রকাশ্য বক্তৃতা দিবার পূর্ব্বে এক-বার এইরূপ অভিনয় করিয়া লইতেন।

বক্তৃতাকালে মধ্যে মধ্যে স্কন্ধদেশ সঙ্কুচিত করা, এবং তৎসহ শরীরটাকে উর্দ্ধদিকে উন্নমিত করা, তাঁহার একটী নিতান্ত কদর্য্য অভ্যাস ছিল। এই অভ্যাস দূর করি-বার জন্য তিনি স্বগৃহে একটী ক্ষুদ্র বক্তৃতা-মঞ্চ প্রস্তুত করাইলেন, এবং তদুপরি এমন উর্দ্ধে একখানি তর-বারি ঝুলাইয়া রাখিলেন, যে তিনি মঞ্চে দণ্ডায়মান

হইলে তরবারি তাঁহার মস্তক স্পর্শ করে মাত্র। এই অবস্থায় দণ্ডায়মান হইয়া তিনি বক্তৃতা আবৃত্তি করিতেন। যদি অভ্যাসদোষে ভ্রান্তিক্রমে কদাচিৎ স্কন্ধদেশ সঙ্কুচিত হইত এবং শরীরের ঊর্দ্ধগতি হইত, তবে মস্তকে তরবারির আঘাত তাঁহাকে তৎক্ষণাৎ তাঁহার ভ্রান্তি স্মরণ করাইয়া দিত। ক্রমে এই অভ্যাস দূরীভূত হইল।

এই সকল ভাব ভঙ্গি শিখিবার চেষ্টার সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার জ্ঞানার্জ্জনের চেষ্টারও অভাব ছিল না। তদ্‌বিষয়ে তাঁহার যত্ন ও পরিশ্রম আরও বিস্ময়কর। গৃহে থাকিয়া অধ্যয়ন করিলে মনোযোগের ব্যাঘাত ঘটিতে পারে—এই আশঙ্কায় তিনি মৃত্তিকাভ্যন্তরে একটী প্রকোষ্ঠ নির্ম্মাণ করাইলেন। এই নির্জ্জন গৃহে দ্বাররুদ্ধ করিয়া অবিরত অধ্যয়ন করিতেন। এইরূপ একাকী পরিশ্রম করিতে করিতে, পাছে বা কখনও সূর্য্যালোকে লোকালয়ে আগমন করিতে প্রলোভন জন্মে, এই আশঙ্কায় তিনি অর্দ্ধ মস্তকের কেশ ও অর্দ্ধ গণ্ডের শ্মশ্রু মুণ্ডন করিয়া রাখিতেন; কারণ এই অবস্থায় সাধারণ লোকের নিকট আগমন নিতান্তই উপহাসের বিষয়। এইরূপে সপ্তাহের পর সপ্তাহ, মাসের পর মাস একাদিক্রমে অধ্যয়নে ও বক্তৃতা-রচনায় অতিবাহিত হইত। তিনি কিরূপ পরিশ্রমী ও দৃঢ় প্রতিজ্ঞ

ছিলেন, নিম্নলিখিত ঘটনায় তাহার কতক পরিচয় পাওয়া যাইবে। গ্রীসদেশের সর্ব্ব প্রধান ইতিহাস-লেখকের রচনা-প্রণালী অনুকরণ মানসে, তৎপ্রণীত বিস্তৃত ইতিহাস, ডিমস্থেনিস্ স্বহস্তে আটবার পত্রস্থ করিয়াছিলেন; কারণ কোন বিষয়ের মানসিক বা মৌখিক আবৃত্তি অপেক্ষা, ঐ বিষয় লিখিবার সময় তৎপ্রতি আমাদের অধিক মনোযোগ আকৃষ্ট হয় এবং তদ্ধেতু উহা অধিকক্ষণ আমাদের স্মৃতিপথে বিদ্যমান থাকে। ইহাতে কতদূর অধ্যবসায়ের প্রয়োজন, তাহা যাঁহারা কিয়ৎপরিমাণেও এই উপায়ে শিক্ষালাভে সচেষ্ট হইয়াছেন, কেবল তাঁহারাই কিছু বুঝিতে পারিবেন।

ঐইরূপ কঠোর পরিশ্রম ডিমস্থেনিস্ ২। ১ দিন করিয়াই ক্ষান্ত হন নাই। ক্রমাগত দশ বৎসর ধরিয়া তিনি পূর্ব্বোক্ত রূপে স্বাভিলাষ-সিদ্ধি বিষয়ে কঠোর সাধনা করিয়াছিলেন। ক্রমে তাঁহার প্রতীতি জন্মিল যে প্রকাশ্য বক্তৃতা প্রদানে তাঁহার ক্ষমতা জন্মিয়াছে। অতএব সপ্তবিংশতি বৎসর বয়ঃক্রম কালে তিনি পুনরায় সাধারণ সমক্ষে বাহির হইয়া প্রথমতঃ ব্যবহারজীবীর ব্যবসায় অবলম্বন করিলেন। এই ব্যবসায়ে কয়েক বৎসর অতিবাহিত করিয়া তিনি দেশের শাসনবিষয়ে মনোযোগ দিলেন, এবং

রাজ্যের প্রধানতম পদে নিযুক্ত হইলেন। তাঁহার স্বদেশ-হিতৈষিণা জগৎপ্রসিদ্ধ। এই সময়ে এক প্রতিবেশী নৃপতি গ্রীসের স্বাধীনতা হরণের জন্য সচেষ্ট হইয়া ছিলেন। ডিমস্থেনিস্ এই নৃপতির অভিসন্ধি বুঝিতে পারিয়া, স্বদেশীয়দিগকে উত্তেজিত করিবার মানসে যে সকল বক্তৃতা প্রদান করিয়াছিলেন, জগতের সাহিত্যে তাহা চিরদিনের জন্য বিখ্যাত হইয়া রহিয়াছে। তিনি এখন দেশমধ্যে সর্ব্বপ্রধান স্বদেশপ্রেমিক বক্তা বলিয়া স্বীকৃত ও পূজিত হইতে লাগিলেন। তাঁহার জীবনের অবশেষাংশ নানা ঘটনায় পরিপূর্ণ। তৎসমুদায়ের আলোচনা এখানে নিষ্প্রয়োজন। এই পর্য্যন্ত বলিলেই যথেষ্ট হইবে, যে সুখে শান্তিতে তাঁহার জীবন অতিবাহিত হয় নাই; তিনি কখন ভাগ্যলক্ষ্মীর ক্রোড়ে লালিত, কখন বা দুর্দ্দশা রাক্ষসীর করকবলিত হইয়া দিন কাটাইয়াছেন। তাঁহার জীবনের পরিসমাপ্তিও নিতান্ত শোচনীয়। বিদেশীয় শত্রুর আক্রমণ হইতে স্বদেশ রক্ষার জন্য শত চেষ্টা করিয়াও যখন সফলপ্রয়াস হইতে পারিলেন না; যখন শত্রুহস্তে বন্দী হইয়া চিরদাসত্বের বা ঘাতকের নিষ্ঠুর কুঠারে জীবন-পরিসমাপ্তির সম্ভাবনা দেখিলেন, তখন অগত্যা আত্মীয় পরিজন লইয়া স্বদেশ পরিত্যাগ করিলেন, কিন্তু স্বাধীনতা

পরিত্যাগ করিলেন না। কিন্তু তাঁহার মন ভাঙ্গিয়া গিয়াছিল; তিনি অধিক দিন এই অবস্থায় থাকিতে পারিলেন না; বিষ পান করিয়া প্রাণত্যাগ করিলেন। যাহাহউক তাঁহার জীবন যে অধ্যবসায় ও পরিশ্রমের এবং স্বদেশ হিতৈষিতার এক অসাধারণ দৃষ্টান্তস্থল, তাহা পূর্ব্বোক্ত ঘটনাবলীর দ্বারা সপ্রমাণিত হইয়াছে।

সত্যপরায়ণতা।

যে সকল গুণযুক্ত হইলে মানব-চরিত্র আমাদের নিকট পরম আদরণীয় হয়, তন্মধ্যে সত্যপরায়ণতা একটী অতি শ্রেষ্ঠ গুণ। এমন কি এই সত্যপরায়ণতাকে অন্য সকল গুণের ভিত্তি ভূমি বলা যাইতে পারে। সত্যস্পৃহা মানব মনের স্বাভাবিক অবস্থা। অথচ অনেক সময়ে আমরা এই স্বাভাবিক অবস্থা হইতে বিচ্যুত হইয়া অসত্যের আশ্রয় গ্রহণ করি। এইরূপ করার কারণ অনুসন্ধান করিলে, আমরা দেখিতে পাইব যে ইহার প্রধানতঃ দুইটী কারণ। এক অভ্যাসদোষ, দ্বিতীয় মনের দুর্ব্বলতা। অভ্যাসের মত পরম মিত্র বা পরম শত্রু আর কেহ নাই। দুই চারি দিন কোনও ভাবে কোনও কাজ করিলে, তৎপ্রতি মনের

একটী আকর্ষণ জন্মিয়া যায়; ক্রমে ঐ কার্য্য ঐ ভাবে করিতে মনোমধ্যে একটী বলবতী আকাঙ্ক্ষা হইয়া উঠে; এবং সুযোগ ঘটিলেই আমরা ঐ কার্য্য ঐ ভাবে করিয়া ফেলি। তখন ঐ কার্য্যে আমাদের অভ্যাস জন্মিয়াছে বলিতে হইবে। ভাল বিষয়ে এই অভ্যাসের শক্তি যেরূপ, মন্দ বিষয়েও ঠিক তদ্রূপ। অভ্যাসকে লোকে "দ্বিতীয় প্রকৃতি" বলিয়া জ্ঞান করে। অতএব কোন বিষয়ে একবার অভ্যাস জন্মিয়া গেলে আমরা অনেক সময়েই একরূপ অজানিত ভাবে ঐ অভ্যাসানুযায়ী কার্য্য করিয়া বসি। তখন অভ্যাস বিরুদ্ধ কার্য্য করা অতীব কঠিন হইয়া দাঁড়ায়। অনুসন্ধান করিলে দেখিতে পাওয়া যাইবে, যে অনেকের জীবনেই মিথ্যা-কথন বা অন্যরূপে মিথ্যাচরণ পূর্ব্বাভ্যাসের ফল। শৈশবে মানব মন অনেকটা স্বাভাবিক অবস্থায় থাকে; তখন শিশুর মুখে সত্য বই মিথ্যা কখন শুনা যায় না। বয়োবৃদ্ধি সহকারে শৈশব অতিক্রমিত হইয়া যখন কৈশোর উপস্থিত হয়, তখন আমাদের গতিবিধির সীমা অনেক বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়; আমাদের পরিচিতের সংখ্যা বর্দ্ধিত হয়; আমাদের কার্য্যের পরিমাণও বাড়িয়া চলে। এই সময়টী বড় বিষম সময়; জীবনের এক মহা সন্ধিস্থল। এখন আমাদের বুদ্ধিবৃত্তির তত পরিপক্কাবস্থা নহে; অথচ ঐই সময়ে

আমাদের স্বাধীনতার মাত্রা অল্প নহে। শিশুর ভ্রমণ-বৃত্ত ক্ষুদ্র, কাজেই তাহার উপর পিতা মাতার দৃষ্টিও প্রায় সর্ব্বদা বিদ্যমান। কিন্তু অধিকাংশ স্থলেই পিতা মাতা, বালক এবং তরুণ বয়স্ক যুবকের উপর ইচ্ছানুরূপ দৃষ্টি ও শাসন রক্ষণে সমর্থ নহেন। ইহারা শিক্ষার্থ বিদ্যালয়ে গমন করিবে; তথায় বহুক্ষণ শাসনাধীনে থাকিয়াও অনেকটা স্বাধীন। অনেক সময় বিদ্যালয় বাসগ্রাম বা সহর হইতে বহুদূরে; এমতাবস্থায় শিক্ষার্থিগণ প্রায়ই দূর নগরে স্বাধীন ভাবে কাল যাপন করে। পিতৃগৃহে অভিভাবকের নিকট থাকিলেও বালকগণ সর্ব্বদাই শাসনাধীনে থাকে না; সর্ব্বদাই গুরু সান্নিধ্য অভিপ্রেতও নহে। মোট কথা এই শৈশবের পর হইতেই অপক্ক বুদ্ধি বালক ও যুবকগণ অল্প বা অধিক পরিমাণে স্বাধীন। এই সময় তাহাদের মতিগতি বহুল পরিমাণে চারিদিকস্থ দৃষ্টান্তের দ্বারা নিয়মিত হয়। এমনকি এই দৃষ্টান্তের উপরেই তাহাদের ভাবী চরিত্র নির্ভর করে। এই সময় হইতেই কাহারও বা মিথ্যাকথনে, কাহারও বা সত্য কথনে অভ্যাস জন্মিতে আরম্ভ হয়।

অসত্য কথনের আর একটি প্রধান কারণ মনের দুর্ব্বলতা। সত্য বলিলে পাছে আমার অনিষ্ট হয়, পাছে আমি বিপদে পড়ি, এই ভয়ে অনেক সময়

অনেকে মিথ্যা বলিয়া ফেলে। বালকদিগের মধ্যে এই ভয়ের একটী বিশেষ কারণ আছে। সকলেই জানেন, যে সময় সময় বালকেরা বালস্বভাবসুলভ চপলতা বশতঃ কোন অন্যায় কার্য্য করিয়া বসে। যদি তাহারা জানে যে তাহাদের অভিভাবকগণ এই অপকার্য্য জানিতে পারিলেই, তাহাদের প্রতি কঠোর শাস্তি বিধান করিবেন, তবে প্রায়ই তাহারা কৃতাপকার্য্য গোপন করিতে চেষ্টা করে; জিজ্ঞাসিত হইলে "করি নাই" বলিয়া একেবারেই অস্বীকার করিয়া বসে। ইহার একমাত্র কারণ গুরুতর শাস্তির ভয়। এই অবস্থা অবশ্যই ২।১ দিনে উৎপন্ন হয় না। যখন ক্রমে বালকের মনে এই ধারণা জন্মিয়া যায়, যে মিথ্যা বলিয়া হয়তো ২।১ বার শাস্তির হাত হইতে এড়াইতে পারিব, কিন্তু সত্য বলিলে নিশ্চয়ই নিতান্ত উৎপীড়িত হইব, তখন বালক সত্যকথন অপেক্ষা অসত্য কথনকেই অধিকতর সুবিধা জনক মনে করে, এবং কার্য্যতঃও তদ্রূপ আচরণ করে। এইরূপেও ক্রমে মিথ্যাকথন অভ্যস্ত হইয়া পড়ে।

অনেক সময়ে আবার এরূপও দেখা যায়, যে শৈশব হইতেই বালক মিথ্যা বলিতে আরম্ভ করিয়াছে ইহার প্রধান কারণ অভিভাবকগণের ত্রুটি। মানব-চরিত্রাভিজ্ঞ সকলেই জানেন, যে শৈশব কালে মনুষ্য-

মন যত অনুকরণ করিতে পারে, যত শীঘ্র শীঘ্র জ্ঞানার্জ্জন করিতে পারে, এত আর কোন সময়ে পারে না। এই সময়ে স্মৃতি-শক্তিও প্রবল থাকে। ছয় বৎসর মধ্যে শিশু তাহার এই পৃথিবী-বাসের নিমিত্ত প্রয়োজনীয় সমস্ত জ্ঞানই প্রায় অর্জ্জন করে; অথচ এই জ্ঞান সাক্ষাৎভাবে তাহাকে কেহ শিক্ষা দেয় নাই। চারিদিকের দৃষ্টান্তের দ্বারা অলক্ষিতভাবে তাহার মানসিক ভাবসমূহ গঠিত হইতে থাকে। এই সময়ে পিতা, মাতা, অগ্রজ প্রভৃতি গুরুগণের দৃষ্টান্ত শিশুর জীবনে বদ্ধমূল হইয়া যায়। শিশু কোন পদার্থের জন্য বড় আবদার করিয়া ক্রন্দন আরম্ভ করিয়াছে; অনেক চেষ্টাতে তাহার ক্রন্দন নিবারণ করা গেল না। তখন তাহাকে ঐ পদার্থ কিম্বা তত্তুল্য কোন পদার্থ দেওয়ার অঙ্গীকার করা হইল; তাহার ক্রন্দনও নিবারিত হইল। কিন্তু অঙ্গীকার পালিত না হইলে, শিশুকে শিক্ষা দেওয়া হইল, যে প্রতিজ্ঞানুরূপ কার্য্য না করিলেও চলে। এইরূপ দুই চারি দশটী ঘটনা হইতেই শিশুর স্বাভাবিক সত্যপরতা বিলুপ্ত হইতে আরম্ভ হয়। মনে করুন, কোন প্রতিবাসী আপনার গৃহে আসিয়া আপনার কুঠারখানি চাহিলেন; আপনার দিবার ইচ্ছা নাই; কিন্তু "দিব না" বলিতে আপনার সাহস নাই, পাছে প্রতিবাসী রাগ

করেন। আপনি বলিলেন "আমার কুঠার নাই" অথবা বলিলেন "আমার কুঠার অন্যে লইয়া গিয়াছে।" আপনার শিশু-সন্তান নিকটেই দাঁড়াইয়াছিল; সে দেখিতেছিল গৃহ-কোণে কুঠার রহিয়াছে। এই দৃষ্টান্ত তাহার মনে অঙ্কিত হইল। ইহার দ্বারা কি তাহার স্বাভাবিক সত্যপরতার সমূহ ব্যাঘাত জন্মিল না? এইরূপে নানা ঘটনার দ্বারা দৃষ্টান্তের দোষে মানব-সন্তান সত্যবিচ্যুত হইয়া মিথ্যাভ্যাস করে। অতএব যাঁহারা স্বীয় পরিবারে, স্বীয় সমাজ মধ্যে, বালক বালিকাদিগের সত্যবাদিত্ব দেখিতে ইচ্ছা করেন, তাঁহারা যেন স্বীয় স্বীয় জীবনে প্রতি মুহূর্ত্তে সাবধানে সত্যপরায়ণতার দৃষ্টান্ত দেখাইতে যত্নশীল থাকেন।

মিথ্যাকথনের মত নীচ কার্য্য আর কি আছে? একটী কথা মিথ্যা কহিলে, সেই কথার সামঞ্জস্যরক্ষার জন্য আর দশটী মিথ্যা কথা বলিতে হয়। মিথ্যাবাদীর মত আত্মসম্মানবিহীন লোক আর দেখা যায় না। যে মিথ্যাবাদী, সে সকলের নিকটই ভীরু; পাছে লোকে তাহার মিথ্যা কথা ধরিয়া ফেলে। যে মন্দ কার্য্য করিয়াছে, সে মন্দ কার্য্য স্বীকার করিয়া অনুতপ্ত হইলে, তাহার অপরাধের লাঘব হইতে পারে; কিন্তু কৃতাপরাধ বিষয়ে মিথ্যা বলিলে, অপকার্য্যজনিত

প্রথম পাপের সহিত মিথ্যাকথনরূপ দ্বিতীয় পাপের সংযোগ ঘটিয়া পাপের মাত্রা বর্দ্ধিত করিয়া ফেলে।

যাহারা মিথ্যা বলিয়া আসন্ন বিপদ হইতে উদ্ধার লাভের প্রয়াস পায়, তাহারা নিতান্তই অপরিণামদর্শী। প্রায় সর্ব্বদাই দেখিতে পাওয়া যায় যে সত্য বহুদিন গোপন থাকে না। দুইদিনে হউক, কি দশদিনে হউক, মিথ্যা প্রবঞ্চনা প্রকাশ হইয়া পড়িবেই পড়িবে। তখন প্রবঞ্চকের বড়ই দুরবস্থা; কারণ তখন সে সমাজ মধ্যে সকলের ঘৃণার পাত্র; কেহই তাহার কথায় বিশ্বাস স্থাপন করিতে পারে না। যে একবার মিথ্যাবাদী বলিয়া ধরা পড়িল, সে যদি ভবিষ্যতে নিতান্ত সত্যবাদীও হয়, তবুও তাহার প্রতি লোকের সন্দেহ দূর হয় না। মিথ্যা বলার ইহা এক গুরুতর শাস্তি।

এই মিথ্যাব্যাধি যে কত প্রকারে সমাজ-দেহে প্রবেশ করিতেছে, তাহার সংখ্যা করা দুরূহ। অনেক সময়ে আমরা সাময়িক উত্তেজনাবশতঃ অনেক প্রতিজ্ঞা করিয়া ফেলিতে পারি। উত্তেজনার ভাব অপগত হইলে দেখিতে পাই, প্রতিজ্ঞানুরূপ কার্য্য করা বড় কষ্টসাধ্য; তখন হয়তো মনে মনে নিজের উপরই বিরক্তির সঞ্চার হয়, এবং প্রতিজ্ঞা উপেক্ষা করিবার প্রলোভন উপস্থিত হয়। এমন অবস্থায় অনেকেই প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করিয়া ক্রমে মিথ্যাভ্যাস করিতে থাকেন। প্রতিজ্ঞা

করিবার পূর্ব্বে বিশেষ ভাবে চিন্তাকরা উচিত, কি প্রতিজ্ঞা করিতেছি। যদি ঈপ্সিত কার্য্য সাধ্যায়ত্ত না হয়, তবে তদ্‌বিষয়ে প্রতিজ্ঞা করাই অনুচিত। কিন্তু যখন একবার তুমি কোন বিষয়ে প্রতিজ্ঞা করিয়াছ, তখন প্রাণপণে প্রতিজ্ঞাপালনে যত্নবান্ হওয়া উচিত; তাহাতে শত কষ্ট, শত স্বার্থহানি হউক, তাহাতেও পশ্চাৎপদ হওয়া উচিত নহে। পূর্ব্বকালে হিন্দু-জাতির মধ্যে এই প্রতিজ্ঞাপালনের অতি উচ্চ দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়। রামায়ণ মহাভারত পাঠক মাত্রেই অবগত আছেন, মহারাজা দশরথ ও যুধিষ্ঠির সত্য-পালনের কি অপূর্ব্ব গৌরবান্বিত দৃষ্টান্ত সকল রাখিয়া গিয়াছেন। তাঁহাদের বহুপরবর্ত্তী কালেও হিন্দুদিগের মধ্যে এই সত্যপালন বিশেষ ভাবে অনু-ষ্ঠিত হইত। ভারতবর্ষ সম্বন্ধে গ্রীকদেশীয় ইতিহাস লেখকগণ অনেক মত লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। আরিয়ান নামা কোন ইতিহাসকার লিখিয়া গিয়া-চেন, "ভারতবর্ষের একটী লোককেও কখন মিথ্যা বলিতে শ্রবণ করা যায় নাই।" কিন্তু অতি দুঃখের বিষয়, যে বর্ত্তমান ভারতভূমির পক্ষে আর এই উচ্চ প্রশংসাবাক্য উচ্চারিত হইতে পারে না।

শ্রোতৃবৃন্দের মনোরঞ্জনার্থ কিম্বা চমৎকারিত্ব-সম্পাদন জন্য, কেহ কেহ প্রকৃত বিষয়ের অতিরঞ্জিত

বর্ণনা প্রদান করেন। ইহাও একরূপ মিথ্যা কথা, এবং অনেক সময় এই অভ্যাস গুরুতর দোষে পরিণত হয়। তুমি যাহা দেখিয়াছ, বা শুনিয়াছ, তাহা অন্যের নিকট বলিবার সময় যাহা প্রকৃত সত্য ঘটনা, তাহাই বলিবে। নিজে কিছু বাড়াইয়া কিম্বা ছাড়িয়া দিয়া বলিবে না। কিন্তু দুঃখের বিষয়, যে দৃষ্ট বা শ্রুত বিষয় গল্পচ্ছলে অন্যের নিকট কথনের সময়, অনেকেই স্বেচ্ছামত তন্মধ্যে মিথ্যার রং প্রবেশ করাইয়া গল্পের সৌন্দর্য্য বৃদ্ধি করিতে চেষ্টা পান।

কোন ইংরাজি গ্রন্থকার লিখিয়াছেন যে স্বীয় প্রশংসাবাক্য মানবকর্ণে যেমন অমৃতধারা বর্ষণ করে, এমন আর কিছুতেই করিতে পারে না। তাই এ সংসারে চাটুকারের সংখ্যা এত অধিক। তোমার কোন স্বার্থসিদ্ধির প্রয়োজন হইয়াছে; যাহার দ্বারা স্বার্থসিদ্ধির সম্ভাবনা, তাহার নিকটে গিয়া তাহার কর্ণে কয়েকটী তোষামোদ বাক্য প্রবেশ করাইতে পারিলে, তোমার কার্য্যসিদ্ধির পক্ষে সমধিক সুযোগ ঘটিতে পারে। যাঁহারা এই তোষামোদ বাক্যে আস্থা স্থাপন করিয়া, আপনাদিগকে প্রকৃতই চাটুকারোক্ত গুণাবলী-শোভিত মনে করেন, তাঁহাদিগকে নিতান্ত মূর্খ, অসার, অপদার্থ ভিন্ন আর কি জ্ঞান করা যাইতে পারে? আর যাহারা স্বাভিলাষ সাধনার্থ এইরূপ

মিথ্যা তোষামোদের অবতারণা করে, তাহারা যে কেবল মিথ্যাবাদী তাহা নহে, তাহাদিগকে পরস্বাপহরণকারী ঘোর প্রবঞ্চক বলিয়াও জ্ঞান করিতে হইবে।

অনেকে দ্ব্যর্থঘটিত বাক্য প্রয়োগ করেন। ইহা অতি নীচ প্রকারের মিথ্যা কথা। বক্তার ইচ্ছা যে প্রতারণা করেন; কিন্তু ভবিষ্যতে পাছে ধরা পড়েন, এই ভয়ে কথাটী এমন ভাবে বলেন, যে ধরা পড়িলে দেখাইবেন যে তাঁহার কথার অন্যার্থ হইতে পারে। ইহার মত ভীরুতা আর কি হইতে পারে?

আর এক প্রকারের মিথ্যা কথা আছে। অনেকে সদুদ্দেশ্যে মিথ্যা কথা বলা পাপ মনে করেন না। ইহা এক গুরুতর ভ্রম। যাহা মিথ্যা, যাহা প্রবঞ্চনা, তাহা চিরদিনই পাপ, তাহা সর্ব্বকালে সর্ব্বত্র পরিত্যাজ্য।

এইরূপে নানাপ্রকারে মানব-চরিত্রে মিথ্যাকথনের অভ্যাস জন্মিতে পারে। সর্ব্বদা সাবধান না থাকিলে, আমরা অজানিত ভাবেও মিথ্যা কথা বলিয়া ফেলিতে পারি। অতএব জীবনের প্রতিমুহূর্ত্তে আমাদের আত্ম-দৃষ্টি থাকা উচিত; আমরা যেন সর্ব্বদা আমাদের অনুষ্ঠিত কার্য্যে, আমাদের উচ্চারিত বাক্যে, মনোগত উদ্দেশ্যের অনুসন্ধান করিয়া, একমাত্র পূর্ণ সত্যের উপরে অটলভাবে নির্ভর করিতে শিক্ষা করি। পার্থিব সর্ব্ববিধ স্বার্থ, মায়া, মমতা, স্নেহ, প্রণয়, এমন কি

এই বিশালব্রহ্মাণ্ড এক দিকে, সত্য আর এক দিকে। সত্য অতুলনীয়। এ সংসারের সুখ সুবিধা যতক্ষণ সত্যের অনুকূল, ততক্ষণই তাহারা প্রিয় এবং গ্রহণীয়; কিন্তু যেই তাহারা সত্যের বিঘ্নকারী হইয়া দণ্ডায়মান, অমনি বিষবৎ বর্জ্জনীয়। এই রূপে যাঁহারা সত্যের সাধনা করেন, তাঁহারাই প্রকৃত মনুষ্যত্বলাভে সমর্থ হন।

রেগুলাসের প্রতিজ্ঞা-পালন।

বহুশতাব্দী অতীত হইল, যখন রোমকেরা ধীরে ধীরে, পৃথিবীময় স্বীয়াধিপত্য বিস্তারের প্রয়াস পাইতেছিল, সেই সময় এক প্রবল পরাক্রান্ত, বাণিজ্য-ব্যবসায়ী, প্রভূত ধনশালী সামুদ্রিক জাতি আসিয়া রোমকদিগের প্রতিদ্বন্দ্বী হইল। এই সামুদ্রিক জাতি আফ্রিকার উত্তরোপকূলে কার্থেজ নামক একটী নগর নির্ম্মাণ করিয়া তথায় বাস করিতেছিল। ইহারা এসিয়ার পশ্চিমপ্রান্তবাসী বিখ্যাত ফিনিসিয়ান জাতির একটী শাখা মাত্র। সম্ভবতঃ গৃহবিবাদ বশতঃই ইহারা পূর্ব্বস্থান পরিত্যাগ করিয়া সুদূর আফ্রিকার উপকূলে বাসস্থান পরিবর্ত্তন করিয়াছিল। ইহারা কার্থেজিনিয়ান বা পিউনিক্ নামে পরিচিত

ছিল। ইহাদের মধ্যে সাধারণতন্ত্র শাসনপ্রণালী প্রতিষ্ঠিত ছিল। ইহারা নৌবিদ্যায় সম্যক্ পারদর্শিতা লাভ করিয়া অর্ণবপোত সহকারে বাণিজ্যোদ্দেশে তৎকালজ্ঞাত পৃথিবীর সর্ব্বত্র গমনাগমন করিত। প্রায় সার্দ্ধসপ্তশত বৎসর স্বীয় গৌরব অক্ষুণ্ণ রাখিয়া, অবশেষে খ্রীষ্টের জন্মের দেড়শত বৎসর পূর্ব্বে, রোমক হস্তে ইহারা সম্পূর্ণরূপে পরাস্ত ও উৎসাদিত হইল। শত্রু হস্তে এইরূপ এক সমৃদ্ধজাতির এতাদৃশ সমূলোচ্ছেদ ইতিহাসে অতি অল্পই দেখা যায়।

ভূমধ্য সাগরস্থ বিখ্যাত সিসিলী দ্বীপ লইয়া রোমক ও কার্থেজিনিয়ানদিগের বিবাদের প্রথম সূত্রপাত। এই দ্বীপ কার্থেজ ও রোম নগরদ্বয়ের প্রায় মধ্যভাগে অবস্থিত। সিসিলী দ্বীপে অষ্টবৎসরব্যাপী যুদ্ধের পর রোমের কর্ত্তৃপক্ষগণ স্থির করিলেন যে কার্থেজবাসীদিগকে তাহাদের নিজগৃহে আক্রমণ না করিলে তাহাঁদিগকে হীনবল করা যাইতে পারিবে না। অতএব কার্থেজ নগর আক্রমণের জন্য বন্দোবস্ত হইতে লাগিল। মানিলাস্ এবং রেগুলাস্ নামক দুই বীরপুরুষ এই যুদ্ধের সেনাপতি মনোনীত হইলেন। এই সময়ের রোমান্‌দিগের বিবরণ পাঠ করিলে অতি বিস্মিত হইতে হয়। যাঁহারা এই প্রকাণ্ড যুদ্ধের সেনাপতি নিযুক্ত হইলেন, তাঁহাদের অন্যতম রেগু-

লাস্ একজন সামান্য কৃষক ছিলেন। তাঁহার পার্থিব সম্পত্তির সমষ্টি কয়েক বিঘা জমি মাত্র। যুদ্ধ-প্রয়াণ-কালে একজন বন্ধুর হস্তে তিনি ক্ষেত্রের কৃষিকার্য্যের ভার দিয়া আসিয়াছিলেন। কিছু দিন পরে শুনিতে পাইলেন, ঐ লোকটীর মৃত্যু হইয়াছে, এবং তাঁহার স্ত্রী যে ভৃতিভুক্ কৃষক রাখিয়া ভূমির কর্ষণ কার্য্য সম্পাদন করিতেছিলেন, ঐ ভৃত্য বিশ্বাসঘাতক হইয়া ক্ষেত্রকর্ষণের যন্ত্র প্রভৃতি ও গবশ্বগুলি অপহরণ করিয়া পলায়ন করিয়াছে। এই সংবাদে রেগুলাস্ নিরতিশয় উদ্বিগ্ন হইলেন; তাঁহার আশঙ্কা হইতে লাগিল তাঁহার অবর্ত্তমানে তাঁহার স্ত্রীর ও সন্তানবর্গের অনাহারেই প্রাণবিয়োগ হইবে। তখন রোমের কর্ত্তৃপক্ষগণ রেগুলাসের পারিবারিক অবস্থা অবগত হইয়া তাঁহার পরিবার প্রতিপালনের ভার গ্রহণ করিলেন; এদিকে রেগুলাস্ও সুস্থচিত্ত হইয়া যুদ্ধ কার্য্যে লিপ্ত হইলেন। রোম-ইতিহাসে এইরূপ দৃষ্টান্তের অভাব নাই। জাতীয় উন্নতির প্রথমাবস্থায় রোমানেরা সর্ব্ববিধ বিলাসশূন্য ছিলেন। যাঁহারা রোমের দিগ্বিজয়ী বীর ছিলেন, তাঁহাদের অনেকেই অতি সামান্য অবস্থায় বাস করিতেন। স্বদেশ প্রেমে উন্মত্ত হইয়া স্বদেশ-রক্ষা ও স্বাধিকার-বিস্তার জন্য তাঁহারা হল পরিত্যাগ করিয়া তরবারি গ্রহণপূর্ব্বক সমরক্ষেত্রে অবতীর্ণ হই-

তেন; সমরকার্য্যাবসানে তরবারি পরিত্যাগপূর্ব্বক হল ধারণ করিয়া আবার কৃষিক্ষেত্রে উপস্থিত হইতেন। আর ইদানীন্তন সেনাপতিদিগের দিকে চাহিলে কি দেখিতে পাইব? তাঁহাদের বেশভূষা, তাঁহাদের পারিষদ্‌বর্গ, তাঁহাদের উচ্চ উপাধি, তদপেক্ষা উচ্চ তাঁহাদের ভৃতি—এসব দেখিলে তাঁহাদিগকে এক প্রকাণ্ড নরপতি বলিয়াই ভ্রম হয়।

রেগুলাস্ রণতরি সমভিব্যাহারে কার্থেজাভিমুখে যাত্রা করিলেন। পথে তাঁহার ও কার্থেজের রণতরির মধ্যে এক প্রকাণ্ড সামুদ্রিক যুদ্ধ বাধিল। এই যুদ্ধে রেগুলাসের জয়লাভ হইল—রোমান্‌দিগের এই প্রথম সামুদ্রিক বিজয়। এই সময়ে রোমকেরা আফিকা সম্বন্ধে বিশেষ বিভীষিকাপূর্ণ ছিল। রোমক সৈন্যগণের মনে আশঙ্কা হইতে লাগিল আফ্রিকার উপকূলে তাহাদের নানাবিধ অভূতপূর্ব্ব বিপদ সংঘটন হইবে। হয়তো তাহারা পর্ব্বতাকার হস্তীর পদতলে দলিত, কিম্বা করাল সিংহের করালতর কবলে নিপতিত হইবে; হয়তো প্রকাণ্ড অজাগরের নিশ্বাসপবনাকৃষ্ট হইয়া, কিম্বা অন্যবিধ হিংস্র জন্তুর কোন অজ্ঞাত শরীর-ক্রিয়া দ্বারা নিধন প্রাপ্ত হইবে। তাহারা জানিত আফ্রিকার অগ্নিতুল্য সূর্য্যোত্তাপ ও অস্বাস্থ্যকর জলাভূমি তাহাদের বিশেষ অনিষ্টপ্রদ হইবে। বিশে-

ষতঃ তাহারা পূর্ব্ব কোন যুদ্ধে স্বদেশ হইতে এতাধিক দূরে গমন করে নাই। ইত্যাদি কারণে তাহারা বিষম অসন্তোষের ভাব প্রকাশ করিতে লাগিল। কিন্তু সাহসী রেগুলাস্ তৎক্ষণাৎ কঠোর শাসন দ্বারা সমুদয় বিদ্রোহভাব বিদূরিত করিলেন। ক্রমে রণ-তরিসমূহ নির্ব্বিঘ্নে আফ্রিকার উপকূলে উপস্থিত হইল। রেগুলাস্ সসৈন্যে তীরে অবতরণ করিলেন।

কার্থেজ নগরের চতুঃপার্শ্বস্থ ক্ষেত্রসমূহের শোভা দেখিয়া রোমকেরা বিস্মিত হইল। সুদূর-বিস্তৃত প্রান্তরে, কোথায়ও বা শ্যামল শস্যক্ষেত্র পবনভরে আন্দোলিত হইয়া তরঙ্গ-ভঙ্গের অভিনয় করিতেছে; কোথায়ও বা নানা সুস্বাদু-ফলসমন্বিত তরুরাজি ছায়া-দানে পথিকের শ্রমাপনোদন এবং ফলদানে ক্ষুন্নিবৃত্তি করিতেছে; আবার অন্যদিকে দিগন্তপ্রসারিত তৃণ-ক্ষেত্রে অশ্বগোমেষ প্রভৃতি গ্রাম্যপশুগণ বিচরণ করিতেছে। বর্ত্তমানকালে ধনবানেরা যেমন নগ-রস্থ প্রাসাদ ভিন্নও নগরের বাহিরে বৃহতী উদ্যান-বাটিকা নির্ম্মাণ করিয়া থাকেন, তৎকালে কার্থে-জের সম্ভ্রান্ত ধনিনাগরিকেরাও নগর-প্রাচীরের বহি-র্ভাগে তদ্রূপ অনেক প্রমোদ-প্রাসাদ নির্ম্মাণ করা-ইয়াছিলেন। এই সকল বিলাসভবনের পুষ্পোদ্যান, ফলবৃক্ষের উদ্যান, মানবকৌশলজাত প্রস্রবণরাজি

রোমকদিগের বিস্ময় ও লুণ্ঠনেচ্ছা ঘনীভূত করিয়া তুলিল। রোমকসৈন্যগণ চতুর্দ্দিকস্থ ক্ষেত্ররাজি ও উদ্যানবাটিকা ধ্বংস করিয়া বৈরনির্যাতনবৃত্তি চরিতার্থ করিতে লাগিল। এরূপ কথিত আছে তাহারা প্রায় তিন শত উপনগর ধ্বংস করিয়াছিল। এই সময়ে রোমান্ সৈন্যগণের কোনও নদীতীরে একটী বিশালশরীর সর্পের সহিত সাক্ষাৎ হইল। তাহারা কল্পনা বলেও ইহা অপেক্ষা বৃহত্তর সর্প সৃষ্টি করিতে পারে নাই। এই সর্প দৈর্ঘ্যে অশীতি হস্তপরিমিত এবং নদীতীর ব্যাপিয়া শয়ান থাকিত। জলানয়নার্থ রোমান্‌সৈন্যগণ নদীতীরে গমন করিলে অনেকে এই সর্পের বদনবিবরে আকৃষ্ট হইয়া প্রাণ হারাইত। রোমান্ সৈন্যগণ এই অমানুষিক শত্রুর বধসাধনে কৃতসংকল্প হইয়া বহুবিধ চেষ্টা করিতে লাগিল, কিন্তু তাহাদের কোন অস্ত্রই সর্পের সুদৃঢ় চর্ম্মভেদ করিতে সমর্থ হইল না। অবশেষে তাহারা দুর্গ প্রাচীর ভূমিসাৎ করণোপযোগী বৃহৎ যন্ত্র সকল আনয়ন করিয়া তদ্দ্বারা বহু আয়াস শত্রু বিনাশে সমর্থ হইল।

এদিকে কার্থেজবাসিগণ প্রথমতঃ রোমান্‌দিগের গতিরোধের কোন চেষ্টাই করিল না; তাহারা সন্ধিবন্ধনার্থ রেগুলাসের নিকট দূত প্রেরণ করিল; রেগু-

লাস্ অতি অপমান করিয়া দূতগণকে বিদায় করিলেন। রেগুলাসের হৃদয় অয়স্-তুল্য কঠোর ছিল; দয়াবৃত্তি তথায় প্রবেশাধিকার লাভ করে নাই। তিনি অন্যের প্রতিই কঠোর ছিলেন এমন নহে; আপনার প্রতি তদপেক্ষা শতগুণে অধিক কঠোর ছিলেন; তাহার পরিচয় আমরা ক্রমে পাইব।

কার্থেজবাসিগণ এখন সমূহ বিপদ গণনা করিয়া, দেব-তুষ্টির জন্য তাহাদের দেব-প্রতিমার নিকট ভীষণ নৈবেদ্যের বন্দোবস্ত করিল। প্রতিমার সম্মুখস্থ বৃহৎ অগ্নিকুণ্ডে সর্ব্বোচ্চবংশের শিশুগণ নিক্ষিপ্ত হইল; ভদ্রবংশীয় যুবক ও বৃদ্ধগণ স্বেচ্ছায় আসিয়া অগ্নিকুণ্ডে আত্মসমর্পণ করিতে লাগিলেন। তৎপর তাহারা গ্রীসদেশ হইতে সৈন্য আনয়ন করিল। একজন গ্রীক এখন তাহাদের নেতৃত্ব গ্রহণ করিয়া যুদ্ধের আয়োজন করিল। কার্থেজবাসীদিগের বহু রণহস্তী ও রণ-তুরঙ্গ ছিল। এই গ্রীক সেনাপতি রণহস্তীগুলিকে সর্ব্ব প্রথম ও তদুভয় পার্শ্বে রণতুরঙ্গ সজ্জিত করিয়া, রোমান্দিগের অভিমুখে অগ্রসর হইতে লাগিলেন; রোমানেরা হস্তি-যুদ্ধানভিজ্ঞ ছিল; তাহারা পর্ব্বতা-কার সচলমেঘমালাবৎ দন্তীদিগকে অবলোকনপূর্ব্বক নিতান্ত ভীত হইল; কোনরূপেই তদ্গতিরোধে সমর্থ হইল না। এদিগে হস্ত্যশ্ব সমন্বিত কার্থেজ সৈন্য

ঘোররবে রোমান্ সৈন্যোপরি পতিত হইয়া তাহাদিগকে একেবারে পদদলিত করিয়া ফেলিল। যে সকল রোমান্ সৈন্য রণক্ষেত্র হইতে পলায়নপর হইল, তাহারাই কেবল প্রাণে বাঁচিল। সেনাপতি রেগুলাস্ বহু সংখ্যক স্বীয় পক্ষীয়ের সহিত শত্রু হস্তে পতিত হইলেন। কার্থেজবাসিগণ মহানন্দে বন্দীদিগকে লইয়া গৃহ প্রত্যাগমন করিল। রজনীযোগে তাহারা দেবপ্রতিমা সম্মুখে অগ্নিকুণ্ডে বহুসংখ্যক যোদ্ধৃ-শ্রেষ্ঠ বন্দীকে নিক্ষেপ করিয়া দেবতার তুষ্টি সম্পাদন করিল। কিন্তু রেগুলাসের প্রতি অন্যবিধ দণ্ডের বিধান হইল; তিনি কারাগারে নিক্ষিপ্ত হইলেন, এবং প্রায় দুই বৎসর ধরিয়া কারাগারের নির্জ্জন গৃহে চিন্তাক্লিষ্ট হৃদয়ে জীবনাবসান করিতে লাগিলেন।

এদিকে উভয় পক্ষের যুদ্ধের নিবৃত্তি ছিল না। রোম হইতে নূতন সৈন্য আসিয়া নবোৎসাহে যুদ্ধ কার্য্যে লিপ্ত হইয়াছিল। অবশেষে এক ঘোরতর যুদ্ধে কার্থেজবাসীদের সম্পূর্ণ পরাজয় হইল। তাহারা আর যুদ্ধ করিতে সাহসী হইল না। একেবারে নিরুৎসাহ হইয়া সন্ধির প্রস্তাব করিতে লাগিল। এবার তাহারা রোমের কর্ত্তৃপক্ষদিগের নিকট দূত প্রেরণ স্থির করিল। এই সময়ে তাহাদের স্মরণ হইল যে রোম সেনাপতি রেগুলাস কারাবদ্ধ রহিয়াছেন।

তখন রেগুলাস্ কারাগার হইতে কার্থেজের কর্ত্তৃপক্ষীয়দিগের সম্মুখে আনীত হইলেন। কর্ত্তৃপক্ষীয়গণ রেগুলাস্‌কে বিনয় সহকারে অনুরোধ করিলেন, যে তিনি কার্থেজ-দূত সমভিব্যাহারে রোমনগরে যাইয়া, তথাকার শাসন-সমিতির নিকট কার্থেজেরপক্ষ হইয়া সন্ধি ভিক্ষা করেন, এবং যাহাতে উভয় জাতির মধ্যে সন্ধি স্থাপন হয় তদ্‌বিষয়ে সচেষ্ট হন। কার্থেজবাসিগণ মনে করিয়াছিল, যে রেগুলাস্ রোমের একজন বিখ্যাত যোদ্ধা, রোমের শাসন-সমিতি তাঁহার বাক্য অবহেলা করিতে পারিবেন না। কিন্তু রেগুলাস্‌কে বিদায় দিবার পূর্ব্বে তাহারা তাঁহাকে এই প্রতিজ্ঞাবদ্ধ করিল যে যদি সন্ধি স্থাপন না হয়, তবে রেগুলাস্ পুনরায় কার্থেজে আগমন করিয়া কারাগারে প্রবেশ করিবেন। মূর্খ কার্থেজবাসিগণ ভাবিয়াছিল, যে রেগুলাস্ নিজের কারা-মুক্তির জন্য অবশ্যই সন্ধি স্থাপনার্থ বিশেষ চেষ্টা করিবেন; কিন্তু তাহারা জানিত না যে স্বদেশ-প্রেমোন্মত্ত, উন্নত হৃদয় রোমান্ স্বীয় স্বাধীনতা, এমন কি জীবনাপেক্ষাও, স্বদেশের উন্নতি ও স্বাধীনতাকে শতগুণে প্রিয়তর জ্ঞান করিত।

কারাকষ্টে জীর্ণ শরীর, ব্যথিত হৃদয় বীরপুরুষ কার্থেজ দূতসহ রোমের সুবৃহৎ প্রাচীরোপান্তে আসিয়া

দণ্ডায়মান হইলেন; কিছুতেই দ্বারে প্রবেশ করিলেন না; বলিতে লাগিলেন "আমি এখন বর্ব্বরদিগের বন্দী, আমার শরীর অপবিত্র, অস্পৃশ্য; এই অস্পৃশ্য চরণ বিক্ষেপে পবিত্র মাতৃভূমি কখনই কলঙ্কিত করিব না।" তাঁহার আগমন সংবাদে পতিপ্রাণা মার্সিয়া পুত্র-দ্বয়সহ ঊর্দ্ধশ্বাসে দৌড়িয়া তাঁহার চরণে পতিত হইল; রেগুলাস্ একবার চাহিয়াও দেখিলেন না; তাঁহার মনে হইতেছিল যে তিনি আর রোম-মহিলার স্বামী ও রোম-সন্তানের পিতা হইবার উপযুক্ত নহেন।

বহু অনুরোধেও রেগুলাস্ নগরে প্রবেশ করিলেন না; তখন রোমের শাসন সমিতি প্রাচীরের বাহিরে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। প্রথমতঃ কার্থেজ-দূতগণ স্বীয় নিবেদন জ্ঞাপন করিল। অনন্তর রেগুলাস্ চির পরিচিত রোমান্ সভাসদদিগকে অপরিচিতের ন্যায় সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "হে রোমের শাসন কর্ত্তৃগণ, এই অধম কার্থেজবাসিগণের ভৃত্য; সে স্বীয় প্রভুগণের আদেশানুসারে আপনাদিগের সহিত সন্ধি স্থাপনের ও বন্দীদিগের বিনিময় জন্য ভবৎসকাশে উপস্থিত।" এই কয়টী কথা বলিয়াই রেগুলাস্ প্রস্থা-নোদ্যত হইলেন। তখন রোমক কর্ত্তৃপক্ষীয়গণ তাঁহাকে বলিলেন "বন্ধো, আপনি যাইতেছেন কেন? আপনি সভায় অপেক্ষা করিয়া আপনার মন্ত্রণা দ্বারা

আমাদিগকে সাহায্য করুন।” রেগুলাস্ উত্তর করিলেন “বর্ব্বর-ভৃত্য কখনই মহামহিম রোম-শাসন-সমিতির সদস্য হইতে পারে না।” তখন কার্থেজ-দূতগণ রেগুলাস্‌কে সভায় উপস্থিত থাকিতে আদেশ করায়, তিনি প্রভু আজ্ঞা পালন জন্য সভায় থাকিলেন।

অনন্তর সভাসদগণ তাঁহার মত জিজ্ঞাসু হইলে, সত্যবাদী ন্যায়পরায়ণ রেগুলাস্ নিম্ন লিখিত রূপে স্বীয় মন্তব্য জ্ঞাপন করিলেন। “মহাশয়গণ, আমার মতে আপনাদের সন্ধি করা কখনই উচিত নহে। আমি স্বচক্ষে কার্থেজের দুর্দ্দশা দেখিয়া আসিয়াছি; তাহারা যে আর অধিক দিন যুদ্ধ করিতে সমর্থ হইবে, এরূপ বোধ হয় না; অতএব এখন সন্ধি স্থাপন করিলে রোমের কোনই লাভ নাই, কার্থেজেরই সকল সুবিধা; অতএব আপনারা অপ্রতিহত বেগে যুদ্ধ করিতে থাকুন। কার্থেজবাসিগণের অন্য প্রস্তাব, যে এতদিন যুদ্ধে দুই পক্ষের যে সকল লোক বন্দী হইয়াছে, উভয় পক্ষই তাহাদিগকে পরস্পর বিনিময় করেন—এই প্রস্তাব মত কাজ হইলেও রোমেরই কেবল ক্ষতি। কারণ রোম-হস্তে যে সকল কার্থেজবাসী বন্দী রহিয়াছে, তাহাদের অনেকে সম্ভ্রান্ত বংশীয়, তরুণ বয়স্ক, ও দৃঢ়কায়; কিন্তু কার্থেজ-হস্তে কেবল আমিই একমাত্র রোম-সেনাপতি বন্দী রহিয়াছি। আমি কার

বাসে নিতান্ত ভগ্ন-শরীর হইয়াছি; আমার স্বাস্থ্যের পুনরাগমনের আশা নাই; বিশেষতঃ আমার বোধ হয়, শত্রুগণ আমাকে কোন রূপ বিষ প্রয়োগ করিয়াছে; তজ্জন্য তিল তিল করিয়া আমার জীবনী-শক্তি যেন অবসন্ন হইয়া আসিতেছে; আমি আর অধিক দিন জীবন-ধারণের আশা করি না। ফলতঃ আমি বাঁচিলেও আর কখন কার্য্যক্ষম হইব না। এমতাবস্থায় বন্দি বিনিময়ে রোমের সমূহ ক্ষতি ভিন্ন কিছুমাত্র লাভ নাই। অতএব আপনারা কখনই আমার জন্য কার্থেজি বন্দিগণকে মুক্ত করিবেন না।”

রোমের সভাসদবর্গের হৃদয় রোম-শোণিতেই পূর্ণ ছিল; কিন্তু তাঁহারাও আজ রেগুলাসের এতাদৃশী নিঃস্বার্থকরী বক্তৃতা শ্রবণে স্তম্ভিত হইলেন। তাঁহারা বুঝিতে পারিলেন, যে কার্থেজের প্রস্তাব গ্রহণীয় নহে। তখন রোমের প্রধান পুরোহিত আসিয়া রেগুলাস্‌কে বুঝাইতে লাগিলেন, যে যখন কার্থেজবাসিগণ বল-পূর্ব্বক তাঁহাকে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ করাইয়াছে, তখন রেগু-লাস্ পুনঃ বন্দি-দশায় প্রবেশ করিতে ধর্ম্মতঃ বাধ্য নহেন। তখন রেগুলাস্ গর্ব্ববিস্ফারিতলোচনে পুরোহিত প্রতি নিরীক্ষণ করিয়া বলিতে লাগিলেন, “মহাশয়, আপনি কি মমতাধিক্যবশতঃ আমাকে কল-ঙ্কিত করিতে ইচ্ছা করিয়াছেন? আপনি কি রোমা-

নের একমাত্র সম্বল সত্যবাদিত্ব হইতে আমাকে বঞ্চিত করিতে ইচ্ছা করেন? আমি জানি, কার্থেজ প্রত্যাগমনের পর আমার ভাগ্যে অমানুষিক অত্যাচার ও অতি শোচনীয় মৃত্যু অপেক্ষা করিতেছে; কিন্তু আপনি কি জানেন না, দৃঢ়চিত্ত রোমান্‌গণ তাদৃশ যন্ত্রণা অপেক্ষাও জ্ঞানকৃত-পাপবশতঃ বিবেকদংশনের যন্ত্রণাকে শতগুণে অধিক ভয় করেন? আমি কার্থেজের ভৃত্য হইয়াও রোমানোচিত দৃঢ়তা হইতে এখনও বঞ্চিত হই নাই। আমি প্রত্যাগমনের প্রতিজ্ঞা করিয়া আসিয়াছি; অতএব আমি কার্থেজেই চলিলাম।"

তখন পতিপরায়ণা মার্সিয়া আসিয়া সভাসদদিগকে নির্ব্বন্ধাতিশয় সহকারে অনুরোধ করিতে লাগিলেন যে তাঁহারা রেগুলাস্‌কে কোনরূপে যাইতে না দেন। সভাসদগণ অনেকেই রেগুলাসের বন্ধু ছিলেন; অতএব তাঁহারা মার্সিয়ার অনুরোধের পূর্ব্ব হইতেই রেগুলাস্‌কে রোমে অবস্থান জন্য অনুনয় করিয়া আসিতেছিলেন। কিন্তু কিছুতেই কিছু হইল না। চির বিরহিনী স্ত্রীর গগনভেদী ক্রন্দন, অনাথ পুত্রগণের আর্ত্তনাদ, বন্ধুবর্গের সবিনয় অনুরোধ, এ সকলই পশ্চাতে রাখিয়া মহামতি, দৃঢ় হৃদয় রেগুলাস যেন সহাস্যবদনে বন্দীর শৃঙ্খল পরিধান করিয়া কার্থেজাভিমুখে যাত্রা করিলেন।

কার্থেজ প্রত্যাগমনের পর রেগুলাসের কি দশা ঘটিয়াছিল, তাহার বিশ্বাস যোগ্য কোন বিবরণ পাওয়া যায় না। কেহ বলেন যে তথায় রেগুলাস্ অতি নৃশংস রূপে অত্যাচারিত হইয়াছিলেন। কাহারও মতে তাঁহাকে কারাগারবাস ভিন্ন অন্য কোনও দুঃখ সহ্য করিতে হয় নাই। যাহাহউক রেগুলাস্ স্বদেশ প্রেমের ও সত্যবাদিত্বের যে মহীয়সী কীর্ত্তি রাখিয়া গিয়াছেন; তাহার দ্বারা অনন্তকাল পর্য্যন্ত তাঁহার নাম জগতীতলে পূজনীয় ও তাহার সুমহান্ দৃষ্টান্ত শিক্ষাস্থানীয় থাকিবে।

বিনয়।

বিনয়কে অন্যান্য গুণের ভূষণ স্বরূপ বলিয়া বোধ হয়। সত্য, ন্যায় প্রভৃতি গুণযুক্ত হইয়াও মানব-চরিত্র বিনয়শূন্য হইলে, তাহা লোকসমাজের তাদৃশ প্রিয়কর হয় না। বিনয়ের সাধারণ অর্থ, অন্যের নিকট নম্রতা প্রদর্শন, অন্যের প্রতি শিষ্টাচারাবলম্বন। বিনয়ের গূঢ়ার্থ, মনের এই সরল স্বাভাবিক ভাব যে আমি নিতান্ত অকিঞ্চিৎকর, আমার অহঙ্কৃত হইবার কোন কারণ নাই, আমার অবজ্ঞেয় কোন বিষয় নাই, আমি শিক্ষার্থী, সকলের নিকট হইতেই শিক্ষা-গ্রহণ

ক্ষরিতে প্রস্তুত থাকিব। বস্তুতঃ শিক্ষার পথে অবিনয় এক ঘোরতর প্রতিবন্ধক। মহাত্মা শ্রীগৌরাঙ্গদেব বলিয়াছেন যে তৃণ হইতেও আপনাকে সুনীচ জ্ঞান করিতে না পারিলে কাহারও ধর্ম্মসাধন হইবে না। এই মহান্ উপদেশ, নীতি ও জ্ঞান শিক্ষা বিষয়েও তুল্যরূপে প্রযোজ্য। যে ব্যক্তি নিজকে যথেষ্ট সচ্চরিত্র বলিয়া বিশ্বাস করে, যে অন্যের চরিত্রের সহিত তুলনায় আপনাকে অনেক উন্নত বলিয়া জ্ঞান করে, তাহার হৃদয়ে ক্রমে অভিমান, অহঙ্কার আসিয়া উপস্থিত হয়। তখন তাহার আত্মদৃষ্টি বিনষ্ট হয় এবং তাহার উন্নতির পথ একেবারে বন্ধ হইয়া যায়। কোন এক মহাত্মা বলিয়াছেন "পাপরূপ পিশাচ কখন্ কোন্ দুর্লক্ষ্য সূত্র অবলম্বন করিয়া মনোমন্দিরে প্রবেশ করিবে, কে বলিতে পারে?" বস্তুতঃ আত্মদৃষ্টি সকলের পক্ষেই নিতান্ত প্রয়োজনীয়। অতএব যে ব্যক্তি অন্যের সহিত তুলনায় নিজের স্বভাবের শত ত্রুটি উপলব্ধি করিয়া, সর্ব্বদা সতর্কভাবে বিনীত হৃদয়ে উন্নতি-পিপাসু থাকে, কেবল তাহারই পক্ষে চির উন্নতির পথ মুক্ত রহিয়াছে।

জ্ঞান শিক্ষা সম্বন্ধেও ঠিক সেইরূপ। অনেকেই মহাত্মা সক্রেটিসের উক্তি অবগত আছেন। তিনি বলিতেন যে তিনি এই মাত্র জ্ঞানলাভে সমর্থ

হইয়াছেন যে তিনি কিছুই জানেন না। জ্ঞানগর্ব্বে উন্নতমস্তক সমগ্র গ্রীকগণ তর্কে পরাস্ত হইয়া যাঁহার নিকট অবনতশির হইতে বাধ্য হইয়াছিল, তিনিই বলিতেছেন তিনি কিছুই জানেন না! আবার যে মহাত্মার অগাধ পাণ্ডিত্যবলে সভ্যজগতের বিজ্ঞান-শাস্ত্রে যুগান্তর উপস্থিত হইয়াছে, যাঁহার নিকট ব্রহ্মাণ্ড-তত্ত্ব যেন উদ্‌ঘাটিত হইয়া পড়িয়াছিল, ইংলণ্ডের অমূল্য-রত্ন সেই প্রবীণ নিউটন বলিয়াছেন যে তিনি সাগর-তীরে কয়েকখানি উপলখণ্ড সংগ্রহ করিতে সমর্থ হইয়াছেন মাত্র। নিরহঙ্কারের কি উজ্জ্বলদৃষ্টান্ত; বিন-য়ের কি প্রাণতৃপ্তিকরী, শান্তিবিধায়িনী মূর্ত্তি! ইঁহা-দের চরিত্রপাঠ করিতে করিতে, ইঁহাদের কার্য্যকলাপ চিন্তা করিতে করিতে মন যে কোথায় কোন্ অমৃত-ধামে, কোন্ শান্তি নিকেতনে চলিয়া যায়, তাহা কিছু স্থির করিতে পারা যায় না। জ্ঞানপিপাসু ব্যক্তি-মাত্রেরই সর্ব্বদা স্মরণ রাখা উচিত যে এই বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডের মধ্যে মানবের যাহা জ্ঞাতব্য, তাহার সহিত তুলনায় মানবাধিকৃত জ্ঞান সাগরবক্ষে জলবুদ্বুদ হইতেও সহস্রগুণে সামান্য। অতএব বিন্দু পরিমাণ জ্ঞান লাভ করিতে না করিতেই, তুমি কোন্ সাহসে জ্ঞানী বলিয়া পরিচয় দিতে প্রয়াসী হও; এবং নিজকে জ্ঞানী ভাবিয়া মনে মনে মহাভিমানী হইতে আরম্ভ কর?

মানুষ সামাজিক জীব। মানুষের পক্ষে পিতা, মাতা, ভাই, ভগ্নী প্রভৃতি আত্মীয়বর্গের দ্বারা পরিবৃত ও জ্ঞাতি বন্ধুবান্ধব প্রভৃতি প্রতিবেশিমণ্ডল দ্বারা বেষ্টিত হইয়া বাস করাই স্বাভাবিক। অতএব প্রতি মুহূর্ত্তই একজনকে অন্য জনের সহিত নানা কারণে বাক্যালাপ করিতে হইতেছে। এমতাবস্থায় বিনয় বা শিষ্টাচার প্রতিমুহূর্ত্তই আমাদের একান্ত অবলম্বনীয়। রুক্ষ ও অপ্রিয়ভাষিগণ সত্য বলিয়াও অনেক সময়ই শ্রোতৃবর্গের বিরক্তি উৎপাদন করে। অতএব সত্য-কেও বিনয়াভরণে ভূষিত করিতে না পারিলে, তুমি অভীপ্সিত ফললাভে সমর্থ হইবে না। "মিষ্ট কথায় জগৎ তুষ্ট" এই প্রবাদ বাক্যটী স্মরণ রাখিয়া যেন সকলেই রসনার ব্যবহার করেন।

মনুষ্যদিগকে যখন সমাজ বদ্ধ হইয়াই বাস করিতে হইবে, তখন যাহাতে সমাজ মধ্যে শান্তি সংস্থাপিত থাকে, প্রাণপণে তদনুরূপ চেষ্টা করা সকলেরই একান্ত কর্ত্তব্য। যে সকল কারণ বশতঃ সমাজ মধ্যে নিরন্তর অশান্তি আসিতেছে, তন্মধ্যে সামাজিকদিগের পরস্পরের প্রতি অবিনয়সম্ভূত, দর্পক্রোধমিশ্রিত পরুষ ভাষা প্রয়োগ এক প্রধান কারণ। প্রাত-রুত্থান করিয়াই যাহাদের মুখাবলোকন করিতে হইবে, দিবসের প্রতি কার্য্যে যাহাদের সহায়তার প্রয়োজন,

যে প্রতিবাসীদিগের সহিত "হাটে, ঘাটে, মাঠে" সর্ব্বত্র আচার ব্যবহার করিতে হইবে, যাহাদের অভাবে গৃহবাস বনবাসে পরিণত হয়, এমন নিত্য-সহায় চিরোপকারী প্রতিবাসীর প্রতি সর্ব্বদা সৌজন্য-ব্যবহার করিতে কুণ্ঠিত হওয়া ঘোর মূর্খতা ভিন্ন আর কিছুই নহে। যেমন রুক্ষভাষা প্রয়োগে তোমার বাক্য প্রয়োগ ভিন্ন অন্য কোন ব্যয় নাই, তদ্রূপ বিনয়নম্র ভাষা প্রয়োগেও বাগিন্দ্রিয়ের চালনা ভিন্ন অন্য কোন ব্যয় নাই; অথচ একের দ্বারা তুমি শত শত্রুর সৃষ্টি করিতেছ, এবং অন্যের দ্বারা তুমি যে শুধু সাধারণপ্রতি-বাসীর মধ্যে মিত্রের সংখ্যা বৃদ্ধি করিতেছ এমন নহে, তুমি শত্রুকেও অনেক সময়ে মিত্রে পরিণত করিতে সমর্থ হইতেছ। একটু অনুসন্ধান করিলেই দেখিতে পাইবে যে রসনার একটু ত্রুটিতে পরিবারে ও সমাজ মধ্যে কত মহা অনর্থ সংঘটিত হইতেছে। পিতা পুত্রে চিরবিরোধ, ভ্রাতৃদ্বয় মধ্যে চিরবিচ্ছেদ, প্রতিবাসী-দিগের মধ্যে চিরশত্রুতা অনেক সময়ই অবিনয়প্রসূত বাক্য-প্রয়োগ লইয়াই সংঘটিত হয়।

শিষ্টাচার ছাত্র জীবনের পরম সুহৃৎ। অহঙ্কারো-দ্ধত শিক্ষার্থীর মানসক্ষেত্র মরুতুল্য অনুর্ব্বর; তথায় গুরূপদেশ অঙ্কুর লাভে সমর্থ হয় না; বা অঙ্কুরিত হইলেও অধিক দিন সজীব থাকে না। পরন্তু উদ্ধত

শিষ্যের সম্মুখে গুরুহৃদয়ের সদ্বৃত্তিনিচয় যেন স্ব-প্রকাশে বাধা প্রাপ্ত হয়। প্রকৃতই শিক্ষাদানের শ্রেষ্ঠত্ব শিক্ষার্থীর ভাববিশেষের উপর বহু পরিমাণে নির্ভর করে। যেখানে শিক্ষার্থীর মধ্যে মনোযোগ, সহিষ্ণুতা, গুরুবাক্যে শ্রদ্ধা, গুরূপদেশ পালনে ঐকান্তিক ব্যগ্রতার ভাব লক্ষিত হয়, তথায় গুরুর হৃদয়-নিহিত সদ্ভাবরাশি উদ্বেলিত হইয়া উঠে; গুরু যেন প্রেমবাহু প্রসারণ করিয়া শিষ্যকে হৃদয় মধ্যে আকর্ষণ পূর্ব্বক তাহাকে স্বীয় হৃদয়-কন্দরের সমগ্র রত্নাবলীর অধিকারী করিতে প্রয়াসী হন। অতএব ইহা স্থির নিশ্চয় যে গুরু শিষ্যের পরস্পর সাহায্য ভিন্ন, কখনই শিক্ষাদান কার্য্য সুচারুরূপে নির্ব্বাহিত হইতে পারে না।

আবার যখন ছাত্রবৃন্দ আপনাদের মধ্যে কোন বিষয়ের সমালোচনে প্রবৃত্ত হন, তখনও শিষ্টাচার ও সহিষ্ণুতার উপরই সত্য-নির্দ্ধারণ সম্পূর্ণরূপে নির্ভর করে। যদি বিচার গৃহে প্রত্যেকেই স্বীয় মতপ্রাধান্য রক্ষার জন্যই যত্নবান্ হন, যদি প্রতিপক্ষের যুক্তির প্রতি সমুচিত শ্রদ্ধা প্রদর্শনপূর্ব্বক তাহার ঔচিত্যানুচিত্য গ্রহণে বীতস্পৃহ হন, যদি কেহ স্বমতবিরুদ্ধ বাক্য শুনিয়াই অধীর হইয়া ঔদ্ধত্য প্রকাশ ও দাম্ভিকোচিত ব্যবহার করিতে আরম্ভ করেন, তবে কোন সত্য

মীমাংসায় উপনীত হওয়ার পরিবর্ত্তে, সভ্যগণ আত্ম-কলহে হৃদয়মন পীড়িত করিয়া গৃহে প্রত্যাগমন করেন।

ছাত্রজীবনের অবসানে যখন যুবক সংসারের কার্য্য-ক্ষেত্রে প্রবেশ করেন, তখনও বিনয় ও শিষ্টাচার তাঁহার প্রধান সহায়—সর্ব্বপ্রধান সহায় বলিলেও অত্যুক্তি হইবে না। তাঁহার অসাধারণ পাণ্ডিত্য, সত্যবাদিত্ব, কার্য্যোৎসাহ প্রভৃতি মহদ্‌গুণরাশিও এক শিষ্টাচারের অভাবে পণ্ড হইয়া যাইতে পারে। অর্থোপার্জ্জনার্থ যুবককে কোন ব্যবসায় অবলম্বন, কিম্বা কোনরূপ চাকুরী অন্বেষণ করিতে হইবে। ব্যব-সায় অবলম্বন করিলে প্রথমতঃ কাজকর্ম্ম শিখিবার জন্য, পরে ব্যবসায়ের কার্য্যবশতঃই দশ জনের সহিত মিশা-মিশি করা নিতান্ত প্রয়োজন। এই সময় বিনয় ও শিষ্টাচার দ্বারা অন্যের নিকট হইতে যতদূর সাহায্য পাওয়া সম্ভব, তদভাবে তাহার শতাংশের একাংশও পাইবার আশা নাই। চাকুরী প্রার্থীর যে বিনীত ও শিষ্টাচারী হওয়া উচিত, তদুল্লেখ নিষ্প্রয়োজন; কারণ এরূপ প্রভু অতি বিরল, যিনি মিষ্টভাষী, আদেশ-পালনে তৎপর ভৃত্যের পরিবর্ত্তে উগ্রমূর্ত্তি, কলহপ্রিয়, তার্কিক ভৃত্য নিযুক্ত করিতে প্রস্তুত হইবেন।

এইরূপে দেখা গেল জীবনের প্রতি অবস্থায়, কি

শৈশবে পরিবার মধ্যে, কি বিদ্যালয়ে শিক্ষকসকাশে ও সতীর্থগণ মধ্যে, কি সংসারের কার্য্যক্ষেত্রে সর্ব্বত্রই বিনয় মানবের এক প্রধান অবলম্বন।

সমাজ মধ্যে একরূপ মৌখিক বিনয়ের অভিনয় দেখা যায়। হৃদয়ে প্রকৃত শিষ্টাচারের নামগন্ধ নাই, হৃদয়ে সর্ব্বদাই নানাবিধ অভিমান জাগরূক রহিয়াছে, তবুও লোক সমাজে প্রতিপত্তি লাভার্থ অনেকে একরূপ আড়ম্বরময় বিনয় দেখাইয়া থাকেন। ইহা নিতান্ত প্রতারণা, ইহার সহিত আমাদের কিছুমাত্র সহানুভূতি নাই; মানব মাত্রেরই এরূপ বিনয় প্রদর্শনের প্রতি অবিমিশ্র ঘৃণা থাকা উচিত। আবার ইহাও স্মরণ রাখা উচিত যে তোষামোদ ও বিনয় এক বস্তু নহে, প্রয়োজন মত পিতা, মাতা, গুরু, প্রভু সকলকেই প্রকৃত সত্য, নির্ভয় হৃদয়ে বলা যাইতে পারে; কিন্তু কোন অবস্থাতেই ঔদ্ধত্য ও অশিষ্টাচার ক্ষমার্হ নহে।

সার আইসাক্ নিউটন।

উপরে যে মহাত্মার নাম লিখিত হইল, তিনি ইংলণ্ডের সর্ব্বপ্রধান অঙ্কশাস্ত্র ও প্রকৃতিবিজ্ঞানবিৎ পণ্ডিত ছিলেন। অশিক্ষিত সামান্য গৃহস্থের ঘরে জন্মগ্রহণ করিয়াও অতি শৈশব কাল হইতে তিনি

যেরূপ প্রতিভা ও চিন্তাশীলতার পরিচয় দিয়া গিয়াছেন, এরূপ দৃষ্টান্ত সমগ্র পৃথিবীতেও অতি বিরল। কিন্তু তিনি জগদ্বিখ্যাত পণ্ডিত ছিলেন বলিয়াই আমরা তাঁহার প্রশংসা করিতেছি না। একদিকে তাঁহার মন যেরূপ অসাধারণ বুদ্ধিশক্তির আধার হইয়াছিল, অন্যদিকে তাঁহার হৃদয় অতুলনীয় সদ্‌ভাবরাশির দ্বারা নিয়ত পরিপূর্ণ ছিল। ফলতঃ তাঁহার চরিত্রে বিদ্যা ও বিনয়ের অতি শোভন মণিকাঞ্চন সংযোগ সংঘটিত হইয়াছিল। এরূপ মহাত্মার জীবনের ঘটনাবলী শিক্ষার্থী মাত্রেরই নিতান্ত অধীতব্য।

প্রায় সার্দ্ধদ্বিশত বৎসর গত হইল, ইংলণ্ডের অন্তঃপাতী লিন্‌কলনসায়ার নামক প্রদেশের একটী ক্ষুদ্র গ্রামে সামান্য গৃহস্থের ঘরে এই মহাত্মার জন্ম হয়। ইংলণ্ডসমাজে ভদ্রবংশীয় ও শ্রমজীবী এই উভয়ের মধ্যবর্ত্তী এক শ্রেণীর লোক আছে। নিউটনের পিতা সেই শ্রেণীর লোক ছিলেন। তাঁহার অনেক কৃষিক্ষেত্র ও গো, মেষ প্রভৃতি গৃহস্থের নিত্য প্রয়োজনীয় অনেক পশু ছিল। এই সকল ক্ষেত্রের কৃষিকার্য্য ভৃত্যের দ্বারা সম্পাদিত হইত। বালক নিউটনকে মেষচারণ কার্য্যে সাহায্য করিতে হইত এবং ক্ষেত্রস্থ ভৃত্যদিগের কার্য্যের তত্ত্বাবধান করিতে হইত। অতএব বাল্যাবস্থায় তাঁহার বিদ্যাশিক্ষার যে কোনরূপ ভাল বন্দোবস্ত হইয়াছিল,

এরূপ বোধ হয় না। দ্বাদশ বৎসর বয়ঃক্রম কালে তিনি নিকটবর্ত্তী গ্রান্থাম নগরের অবৈতনিক বিদ্যালয়ে শিক্ষার্থ প্রেরিত হন। কথিত আছে প্রথমতঃ তিনি অধ্যয়ন বিষয়ে তত মনোযোগী ছিলেন না, এবং অতি অল্পই শিখিতে পারিয়াছিলেন। একদিন সমপাঠী একটী ছাত্রের সহিত তাঁহার কোনও কারণে বচসা হয়। ঐ ছাত্রটী তাহা অপেক্ষা ভাল পড়া দিতে পারিত ও তাঁহার উপরে থাকিত। নিউটন স্বভাবতঃই নিতান্ত নম্র ও শান্ত স্বভাববিশিষ্ট ছিলেন। কাহারও সহিত কখন কলহ করিতেন না। অতএব বোধ হয় ঐ ভাল ছাত্রটীর দোষেই বচসা আরম্ভ হইয়াছিল। যাহা হউক বিবাদকালে ঐ ছাত্রটী নিউটনের উদরে সজোরে পদাঘাত করিল। নিউটন বড় বেদনা পাইলেন; কিন্তু নিজে ভাল ছাত্র ছিলেন না বলিয়াই বোধ হয় কোনরূপ প্রতিশোধ লইতে পারেন নাই। যাহা হউক তিনি সেই দিন হইতে কঠোর পরিশ্রম আরম্ভ করিলেন এবং অল্প দিন মধ্যেই সেই অহঙ্কারী ছাত্র অপেক্ষা ভাল পাঠ দিতে লাগিলেন এবং ক্রমে সমপাঠীদের মধ্যে প্রথম স্থান অধিকার করিলেন।

এই বিদ্যালয়ে পাঠকালীন তাঁহার সম্বন্ধে আরও দুই একটা গল্প আছে। পরজীবনে তিনি যে অসাধারণ চিন্তাশীলতার পরিচয় দিয়াছিলেন, তাহার

পূর্ব্বাভাস এখান হইতেই পাওয়া গিয়াছিল। বিদ্যালয়ের ছুটী হইলে ছাত্রবৃন্দ ক্রীড়ায় নিযুক্ত হইত; তখন বালক নিউটন নির্জ্জনে বসিয়া নানারূপ যন্ত্র নির্ম্মাণ করিতেন। একদা একটী পুরাতন বাক্সে জলপূর্ণ করিয়া তাহার উপর একখানি তক্তা ভাসাইয়া দিলেন, এবং বাক্সের গায়ে এমনভাবে একটী কাঁটা সংযোগ করিলেন, যে বাক্সস্থিত জল নির্গমনের সঙ্গে সঙ্গে যেমন ভাসমান কাষ্ঠখণ্ডখানি ধীরে ধীরে নিম্নগামী হইতে লাগিল, সেই সঙ্গে সঙ্গে পূর্ব্বোক্ত কাঁটাটীও ঘড়ীর কাঁটার মত ঘূরিতে লাগিল। বাস্তবিকই ইহা একটী জলঘড়ী হইল। পূর্ব্বকালের গ্রীক ও রোমান্ জাতীয় লোকেরা এইরূপ জলঘড়ীর দ্বারা সময়ের পরিমাণ করিত।

এই বাল্যজীবনেই পুত্রের গভীর বুদ্ধিমত্তার ও নিতান্ত শিক্ষানুরাগের পরিচয় পাইয়াও নিউটনের পিতা পুত্রকে উচ্চশিক্ষা দিতে ইচ্ছা করিলেন না। তিনি পুত্রকে স্বীয় পিতৃপৈতামহিক ব্যবসায় শিক্ষা দিবার জন্য সংকল্প করিলেন। তদনুসারে নিউটন মেষচারণ ও ক্ষেত্রে ভৃত্যদের কর্ষণ ও বপন প্রভৃতি কার্য্যের তত্বাবধারণ জন্য নিযুক্ত হইলেন। কিন্তু প্রকৃতি পরিবর্ত্তন অনায়াসসাধ্য নহে। তিনি এই কার্য্যে কিছুমাত্র মনোযোগ দিতে পারিতেন না।

একদা দৃষ্ট হইল, বালক ক্ষেত্রস্থ একটী বৃক্ষের শীতল-চ্ছায়ায় উপবিষ্ট হইয়া একাগ্রচিত্তে গ্রন্থাধ্যয়নে নিযুক্ত রহিয়াছে। অন্য একদিন কতকগুলি মেষ বিক্রয়ের জন্য, নিউটন উপরোক্ত গ্রান্থাম নগরের হাটে প্রেরিত হইয়াছিলেন। তাঁহার সমভিব্যাহারে একজন পুরাতন ভৃত্যও প্রেরিত হইয়াছিল। নিউটন জানিতেন যে ঐ ভৃত্য ক্রয় বিক্রয় বিষয়ে তাঁহার অপেক্ষা অধিক অভিজ্ঞ; সুতরাং মেষ-বিক্রয়ের ভার ভৃত্য হস্তে ন্যস্ত করিয়া, তিনি স্বয়ং হাটের কোন নিভৃত স্থানে একটী শুষ্ক তৃণস্তূপের উপর উপবিষ্ট হইলেন; এবং অঙ্ক-শাস্ত্রের একটী সমস্যাপূরণ কার্য্যে নিযুক্ত হইলেন।

নিউটনের এই ব্যবহার দর্শনে ক্রমে সকলেই স্পষ্ট বুঝিতে পারিলেন যে কৃষকজীবন-যাপন জন্য তিনি সৃষ্ট হন নাই। উচ্চশিক্ষার জন্য এখন তাঁহাকে বিখ্যাত কেমব্রিজ নগরে প্রেরণ করাই স্থিরীকৃত হইল; এবং ঊনবিংশ বৎসর বয়ঃক্রমকালে নিউটন কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্তর্ভূত ট্রিনিটী কলেজ নামক বিদ্যালয়ে প্রবেশ করিলেন। বোধ হয় এই ঘটনাই নিউটনের জীবনের সর্ব্বপ্রধান ঘটনা। কারণ তাঁহার ভাবী মহত্ব সমস্তই এই ঘটনার উপর নির্ভর করিতেছে। এই কেমব্রিজ নগরে অধ্যয়ন কালেই

তাঁহার স্বাভাবিকী মানসিক বৃত্তির সম্যক্ পরিস্ফুটন হইয়াছিল; এবং তন্নিবন্ধনই তিনি দুরূহ অঙ্ক শাস্ত্রের অতি নিগূঢ় তত্ত্ব সকল আবিষ্কার করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। অতএব এই ঘটনার জন্য তিনি যাঁহার নিকট অধিকতম ঋণী, তাঁহার নাম এখানে উল্লেখযোগ্য। পুত্রগুণাভিমানিনী স্নেহময়ী জননীর একমাত্র চেষ্টাতেই নিউটনের ভাগ্যে এরূপ উচ্চ শিক্ষা লাভের সুবিধা ঘটিয়াছিল। ইতিহাসে অনেক মহাত্মার জীবনে দেখা যায় যে তাঁহাদের জননীগণই তাঁহাদের মহত্ত্বের প্রধান কারণ। নিউটনের জীবনেও সেই দৃষ্টান্ত অভিনীত হইয়াছিল। আরও আশ্চর্য্যের বিষয় এই, যে নিউটনের মাতা অশিক্ষিতা হইয়াও স্বীয় স্বাভাবিকী প্রতিভার বলে বুঝিয়াছিলেন যে তাঁহার পুত্রের ইচ্ছানুরূপ শিক্ষাদান তাঁহার একান্ত কর্ত্তব্য; এবং এইরূপ কর্ত্তব্যবোধপ্রভাবেই শত বাধাবিঘ্ন অতিক্রম করিয়াও তিনি পুত্রের উচ্চশিক্ষাদানে বদ্ধ-পরিকর ছিলেন; এবং অকালে পতিবিয়োগান্তেও পুত্রের শিক্ষার সমুদয় ব্যয় বহন করিয়াছিলেন।

ট্রিনিটী কলেজে আইসাক বারোনামা বিখ্যাত গণিতাধ্যাপকের নিকট নিউটনের শিক্ষা কার্য্য চলিতে লাগিল। ভগবানের কৃপায় উপযুক্ত শিষ্যের উপযুক্ত গুরু জুটিয়াছিল। শিষ্যের গভীর শিক্ষানুরাগ গুরুর

উৎসাহে ও অধ্যাপন-কৌশলে শতগুণ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইল; নিউটন অতি দ্রুতগতি উন্নতিরপথে চলিলেন। এখানে তিনি যে সকল গ্রন্থ পাঠ করিয়াছিলেন, তাহাদের সবিস্তর উল্লেখ নিষ্প্রয়োজন। কিন্তু তাঁহার অধ্যয়ন পদ্ধতি সম্বন্ধে একটী কথা নিতান্ত উল্লেখযোগ্য। নিউটন সাধারণ শিক্ষার্থীদের ন্যায় পাঠ কেবল কণ্ঠস্থ করিতেন না; যাহা পাঠ করিতেন তদ্বিষয়ে গভীর চিন্তা করিতেন, এবং চিন্তার ফলস্বরূপ যাহা মনে উদিত হইত, তাহা গ্রন্থস্থ পত্রপার্শ্বে মন্তব্যস্বরূপ লিখিয়া রাখিতেন। অধ্যয়ন বিষয়ে তিনি চিরজীবন এই প্রণালী অবলম্বন করিয়াছিলেন। দ্বাবিংশতি বৎসর বয়সে তিনি বি, এ, পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া বি, এ, উপাধি লাভ করিলেন, এবং এই সময়েই তিনি দূরবীক্ষণ যন্ত্রের উন্নতি বিষয়ে চেষ্টা করিতে লাগিলেন। ইহার এক বৎসর পরে কেমব্রিজে মহামারী উপস্থিত হইলে, নিউটন কিয়ৎকালের জন্য গৃহ প্রত্যাবর্ত্তন করিতে বাধ্য হন। এই গৃহাবস্থানকালেই তাঁহার মনে তদাবিষ্কৃত বিখ্যাত মধ্যাকর্ষণতত্ত্বের প্রথমোন্মেষ সংঘটিত হইয়াছিল। এই বিষয়ে একটী বহুলপ্রচলিত গল্প আছে; কিন্তু ইহা বাস্তব ঘটনা কি না, তাহা নিশ্চিতরূপে জানা যায় না। গল্পটী নিম্নে দেওয়া গেল।

একদা তিনি উদ্যান মধ্যস্থ তরুতলে বসিয়া অধ্যয়ন করিতেছিলেন। অধীত বিষয়ের মানসিক আবৃত্তি ও চিন্তন জন্য, ক্ষণকাল মুখোত্তোলন করিয়া সম্মুখে দৃষ্টি করিতেছিলেন; এমন সময়ে দেখিলেন একটী ফল বৃন্তচ্যুত হইয়া ভূপতিত হইল। দৃষ্টিমাত্র তাঁহার পূর্ব্ব চিন্তাসূত্র ছিন্ন হইল এবং ফল-পতন বিষয়ে চিন্তা আকৃষ্ট হইল। তাঁহার মনে প্রশ্ন উঠিল "ফল পতনের কারণ কি?" তখন বায়ু সঞ্চালন হইতে ছিল না, অতএব বায়ু-প্রবাহতাড়িত হইয়া ঐ ফল মৃত্তিকা স্পর্শ করে নাই। আবার ভাবিতে লাগিলেন "বৃন্তচ্যুত হইয়া, ফলটী শূন্যে দোদুল্যমান্ রহিল না কেন? অথবা আরও উর্দ্ধে গমন করিল না কেন?" এইরূপ ভাবিতে ভাবিতে তাঁহার বোধ হইতে লাগিল, যে পৃথিবীর অভ্যন্তরে নিশ্চয়ই এমন কোন অদৃশ্য শক্তি আছে, যাহার বলে ফলটী আকৃষ্ট হইয়া ভূতলে আনীত হইয়াছে; এবং শুধু ফল কেন, ভূ-পৃষ্ঠের উপরিস্থ যাবতীয় পদার্থ এই শক্তির বলে ভূ-পৃষ্ঠে সংলগ্ন রহিয়াছে। ক্রমে গভীরতর চিন্তা ও নানাবিধ পরীক্ষা দ্বারা, তিনি মধ্যাকর্ষণতত্ত্ব সুচারুরূপে প্রতিষ্ঠিত করিয়া, গণিত শাস্ত্রের ও জগতের জ্ঞানরাজ্যের যুগান্তর উপস্থিত করিলেন।

মহামারী ভয়ে বহুদিন তাঁহাকে গৃহে অবস্থান

করিতে হইল। প্রায় দুই বৎসর পরে কেমব্রিজে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন ও অল্প দিন মধ্যেই "এম, এ" উপাধি প্রাপ্ত হইলেন। ইহার পর, প্রতি বৎসর তাঁহার জ্ঞানবৃদ্ধির সঙ্গে পদোন্নতি হইতে লাগিল। তিনি ক্রমে "সার" উপাধি প্রাপ্ত হইলেন। তাঁহার আর্থিক অবস্থারও যথেষ্ট উন্নতি হইল। ইংলণ্ডের রাজপরিবারের সঙ্গে তাঁহার ঘনিষ্ঠতা জন্মিল, এবং যুবরাজ-পত্নী দার্শনিক তত্ত্ব শিখিবার আশায় সর্ব্বদাই নিউটনকে আহ্বান করিতেন। এই সকলের সবিস্তর উল্লেখ নিষ্প্রয়োজন। ফল কথা, ধনমান, পদমর্য্যাদা, যাহা কিছু মানবমনের অভীপ্সিত হইতে পারে, তাহা সমস্তই অমিতরূপে নিউটনের ভাগ্যে ঘটিয়াছিল। অবশেষে চতুরধিক অশীতিবর্ষ বয়ঃক্রম কালে তিনি মানবলীলা সম্বরণ করিলেন। ইংলণ্ডীয় সমাজে চিরদিনই গুণের প্রতি উপযুক্ত শ্রদ্ধা ও ভক্তি প্রদর্শিত হইয়াছে। নিউটন একরূপ নীচ বংশে জন্মগ্রহণ করিয়াও স্বীয় গুণবলে সমাজের অতি উচ্চ স্থানে আরোহণ করিতে পারিয়াছিলেন; এবং মৃত্যুর পর তাঁহার মৃতদেহের প্রতি ইংলণ্ডের অভিজাত বংশ-কর্ত্তৃক যে সম্মান প্রদর্শিত হইয়াছিল, তাহা পাঠ করিলে আশ্চর্য্যান্বিত হইতে হয়। মৃত্যুর পর তাঁহার শব তৎকালোচিত পরিচ্ছদাদিতে শোভিত হইয়া

একটী বিখ্যাত গৃহে রক্ষিত হইল; এখানে দর্শনেচ্ছু শত শত নরনারী আসিয়া একবার শেষ দর্শন করিয়া লইলেন। পরে সমাগত লোকমণ্ডলী মহাসমারোহে শবাধার লইয়া সমাধিস্থানোদ্দেশে যাত্রা করিলেন; এবং ইংলণ্ড-সমাজের সর্ব্বোচ্চবংশের ছয়জন ব্যক্তি শবাধারের উপরিস্থ চন্দ্রাতপ বহন করিয়া চলিলেন। সমাধিক্ষেত্রে যথারীতি শব সমাধিস্থ হইলে, সকলে ভগ্নমনে গৃহ-প্রত্যাগমন করিলেন।

আকারে নিউটন নাতি দীর্ঘ ছিলেন। তাঁহার মুখচ্ছবিতে এমন একটী ভাব নিহিত ছিল, যে তদ্দর্শনে হৃদয়ে যুগপৎ হর্ষ ও ভক্তির উদ্রেক হইত। তিনি চিরদিনই মৃদুস্বভাব ও শান্তিপ্রিয় ছিলেন। ধর্ম্মের প্রতি তাঁহার ঐকান্তিকী ভক্তি ছিল। ধর্ম্মগ্রন্থপাঠে তাঁহার গভীর অনুরক্তি ছিল। তিনি ভিন্নধর্ম্মমতাবলম্বীদিগের প্রতি কখনও বিদ্বেষভাব পোষণ করিতেন না; বরং এইরূপ অনেক লোকের সহিত তাঁহার বন্ধুতা জন্মিয়াছিল। ধর্ম্মান্ধতাবশতঃ সর্ব্ববিধ অত্যাচারকে তিনি নিতান্ত ঘৃণা করিতেন। তাঁহার জীবনে একটী বিস্ময়কর ঘটনা এই, যে এত কোমল-স্বভাব ও এত ধনসম্পত্তির অধিকারী হইয়াও তিনি কখন বিবাহ করা প্রয়োজন মনে করেন নাই। বিবাহ করিলে তাঁহার অধ্যয়নাদির ব্যাঘাত ঘটিতে পারে,

বোধ হয়, এই আশঙ্কায় তিনি বিবাহ করেন নাই। তিনি দৈনিক-জীবনে সম্পূর্ণরূপে বিলাসশূন্য ছিলেন। অতি সামান্য ব্যয়েই তাঁহার সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ হইত। পৈতৃক সম্পত্তির উপসত্ত্ব তিনি সমস্তই জননীকে দিয়াছিলেন। উন্নতির প্রথমাবস্থায় যখন তত আর্থিক সচ্ছলতা ছিল না, তখন মধ্যে মধ্যে খেদ করিতেন, যে ধনাভাববশতঃ ইচ্ছানুরূপ পরদুঃখমোচন ও নিতান্ত প্রয়োজনীয় পুস্তকাদিক্রয় করিতে পারিতেছেন না। তিনি অতিশয় দানশীল ছিলেন, পরোপকারার্থে অকাতরে দান করিতেন। তাঁহার মত অহঙ্কারশূন্য লোকের দৃষ্টান্ত জগতে অতি বিরল; পদমর্য্যাদার কুহকে পড়িয়া তিনি কখন স্বীয় স্বভাবগত সারল্য হইতে বিচ্যুত হন নাই। অবশেষে মৃত্যুর প্রাক্কালে বিনয়ের পরাকাষ্ঠা দেখাইয়া ইহলোক পরিত্যাগ করিলেন। স্বীয় অসাধারণ কার্য্যকলাপের কথা উল্লেখ করিয়া নিউটন বলিলেন, "জানি না, পৃথিবীর লোকে আমাকে কি ভাবে দেখিবে। কিন্তু আমার নিজের নিকট এই বোধ হয়, যে আমি কেবল বালকের মত সমুদ্রকূলে এতদিন ক্রীড়া করিতেছিলাম; এবং তথায় কখন বা একখানি প্রস্তরখণ্ড, কখন বা একটী শুক্তি সংগ্রহ করিয়াছি। কিন্তু রত্নভাণ্ডার সমুদ্র এখনও আমার সম্মুখেই রহিয়াছে, তথায় প্রবেশাধিকার লাভ

করিতে সমর্থ হই নাই।" কথাগুলি শিক্ষার্থী মাত্রেরই হৃদয়ে চিরাঙ্কিত হইবার উপযুক্ত; এবং মহাত্মা নিউ-টনের পুণ্যময় জীবন ব্যক্তি মাত্রেরই অনুকরণীয়।

সম্পূর্ণ।